মারাত্মক

তারাপদ রায়

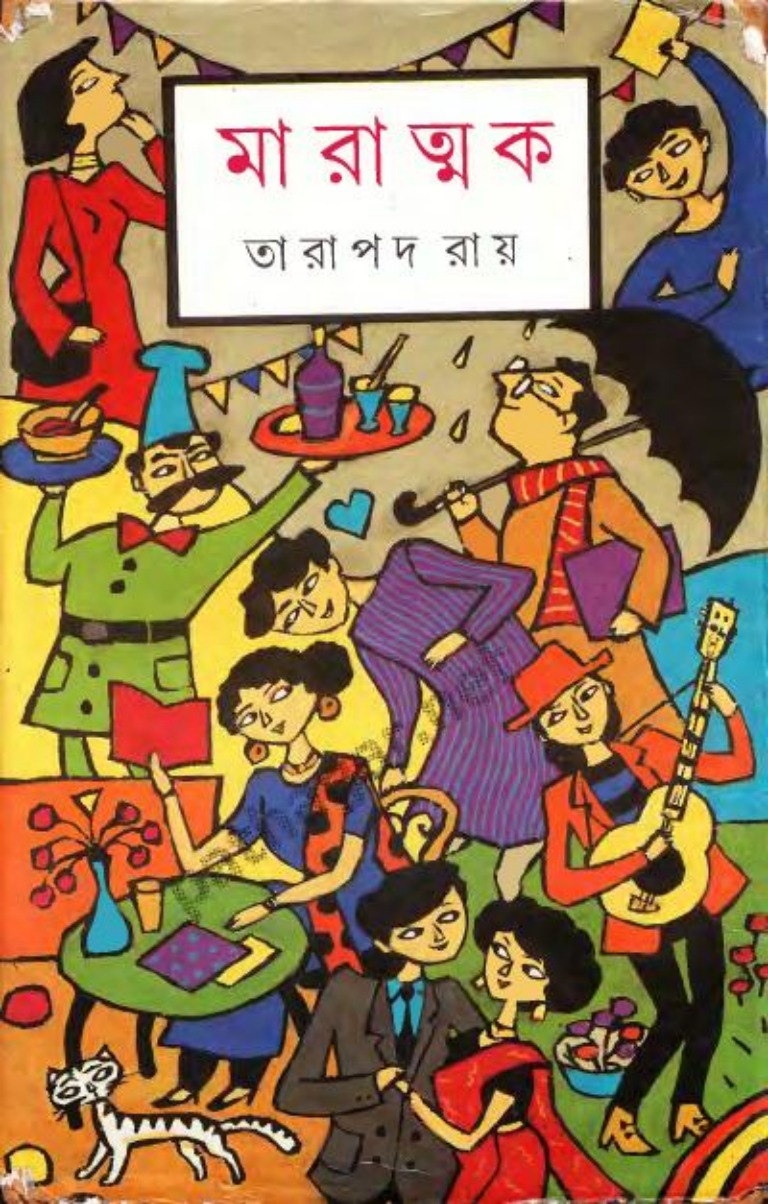

Maratmak
by Turupada Roy
Published by Kaushik Dutta
Anjali Prokashani, E-40 Kalachand Para,
Kamdahari, Garia, Calcutta-700 084

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০
প্রচ্ছদ : দেবাশিষ দেব
অলংকরণ : তাপস সরকার
© মিনতি রায়
ISBN : 81-87114-17-7

প্রকাশক :
কৌশিক দত্ত, অঞ্জলি প্রকাশনী
ই-৪০, কালাচাঁদ পাড়া, কামডহরি, গড়িয়া, কলিকাতা-৭০০ ০৮৪
মুদ্রক :
ইমেজ মেকার, ই-৪০, কালাচাঁদ পাড়া, কামডহরি, গড়িয়া,
কলিকাতা-৭০০ ০৮৪

মূল্য : ৪০.০০

উৎসর্গ

নূপুর ও ডাঃ অসিত দাশ

pathagar.net

ভূমিকা

আমার কোনো রম্য রচনাই নতুন বা পুরনো নয়। সেই একই লেখাগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনা। পাঠক-পাঠিকারা আমার এই কলাকৌশলের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা উদার ভাবে, এটা মেনে নিয়েছেন।

এই বইতে অধিকাংশ রচনাই সাম্প্রতিক হলেও, দু চারটি পুরনো দিনের অগ্রন্থিত রচনা আছে। বিষয় বৈচিত্র্যের অনুরোধে সেগুলো গ্রন্থভুক্ত করা হলো।

ইতি
তারাপদ রায়
১ আষাঢ়, ১৪০৬

এইচ-এ ৫৫
সেক্টর ৩
সল্টলেক
কলকাতা ৭০০ ০৯৭

Pathagar.net

চিড়িয়াখানা

একটা ছোট শহরের ছোট চিড়িয়াখানায় এক বুড়ো সিংহ ছিল। একদিন এক বাচ্চাবয়সী সিংহ সেই শহরে এসে ঘুরতে ঘুরতে সেই চিড়িয়াখানায় ঢুকে পড়ল। সেই বুড়ো সিংহের খাঁচার পাশেই একটা ফাঁকা খাঁচা ছিল তাতেই স্থান হল সেই বাচ্চা সিংহটির। বাচ্চা সিংহটি দেখল বুড়ো সিংহটি নেহাৎই বুড়ো। কাজেকর্মে কোন উৎসাহ নেই। কেশর উঠে গেছে, চোখ দুটো ঝুলে পড়েছে, সামনের কয়েকটা দাঁত নেই। রাতদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয়, আর মাঝে মাঝে দু'একটা লম্বা হাই তোলে চার পা ছড়িয়ে।

বাচ্চা সিংহটির প্রবল উৎসাহ। সে যতই দর্শক দেখতে লাগল ক্রমাগত লাফাতে লাগল, গর্জন করতে লাগল, দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সে কোন কসুর করল না। ওর এই গর্জন, লাফালাফির শব্দে ঘুম ভেঙে

বুড়ো সিংহটি একবার অর্ধেক চোখ খুলে একটু ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। তারপর পাশ ফিরে অকাতরে আবার নিদ্রিত হল।

পরদিন সকালে, চিড়িয়াখানার কর্মচারীরা এসে বুড়ো সিংহকে সেরকয়েক মাংস দিল খাঁচায়। কিন্তু বাচ্চা সিংহ পেল দুটি কলা আর একমুঠো ভেজানো ছোলা।

এমন বৈষম্য কেন করা হল, আর সে হল সিংহ। তাকে কলা আর ছোলা দেওয়ার মানে কি? উত্তরে কর্মচারীরা জানাল, আমাদের ছোট শহরের ছোট চিড়িয়াখানা। আয় অল্প। দুটো সিংহের খরচ আমরা চালাতে পারব না। তাই তোমাকে বাঁদরের খাঁচায় রাখা হয়েছে।

পুজো, পূজা

পূজা মানে অর্চনা, আরাধনা। পূজা শব্দের মধ্যে একটা সাত্ত্বিক ভাব আছে, মহিমা আছে। অভিধানগত অর্থে পূজা মানে নৈবেদ্যাদি দ্বারা আরাধনা। পূজার সঙ্গে অনেক আনুষঙ্গিক ক্রিয়া জড়িত আছে। কবি আক্ষেপ করেছিলেন, তোমার পূজার ছলে, তোমায় ভুলে থাকি।

পুজো চলিত শব্দ। ভারি বা গম্ভীর নয়, তার মধ্যে একটা ঘরোয়া ভাব। গত কয়েক দশক সে দাপটের সঙ্গে পূজার বিপক্ষে লড়ে যাচ্ছে। তবে পূজা এখনও সম্পূর্ণ পশ্চাদপসরণ করেনি।

সে যা হোক, পূজা হোক, পুজো হোক সে এসে গেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেই কেমন পুজো পুজো ভাব। শরতের ঝলমলে রোদ, নীল আকাশের আদিগন্ত তাঁবু। বাইরে শিশিরভেজা ঘাস, ইতস্তত শেফালি।

কবেকার নদী-নৌকো, ঘরে ফেরা মনে পড়ে যায়। বাঙালির মানসে শরতকাল ঘরে ফেরার দিন। সেই ঘর এখন আর কোথাও, কোনখানে নেই। কেউ আর আজকাল বাড়ি ফেরে না। কিন্তু মনের মধ্যে চিরদিনের বাড়ি ফেরা, কোথায় যেন ছিলাম, কোথায় যেন যাব? দূরে কোথাও ঢাক বাজে,

দৈনিকের প্রথম পাতায় কাশের গুচ্ছের ছবি। আমরা কোথাও যাই না, পুজো এসে যায়। পুজোর ভিড়ে আমরা হারিয়ে যাই।

কলকাতায় পুজোর ভিড়, বিশেষ করে অষ্টমী ও নবমীর মধ্য ও শেষরাতে বছর বছর বেড়েই চলেছে। বোধহয় কয়েক লক্ষ লোক সেদিন সারারাত রাস্তায় থাকে। এই ভিড়ের বর্ণনায় খবরের কাগজ মাত্রই মুখর হয়ে ওঠে।

দুটি পুরনো গল্পে এই ভিড়ের আকার প্রকার কিছুটা বোঝা যাবে।

প্রথমটি আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম উত্তর কলকাতায় দেশবন্ধু পার্কের পাশের এক বিখ্যাত পুজোয়। ভিড়ের ধাক্কায় হটতে হটতে একেবারে পুজো প্যান্ডেলের পেছনে কর্মকর্তাদের অফিসঘরের পাশে চলে এসেছি। এখানেও ভিড়ের চাপ রয়েছে, তবে প্যান্ডেলের সামনের অংশের মত নয়।

আমার মত অনেকেই বিশেষত বালক-বালিকা, মহিলা ইত্যাদি এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

আমার সামনে একটি বালক। মনে হল সে দলছুট। ইতিমধ্যে মাইকে তারস্বরে ঘোষণা হল, 'শ্রীমান কুন্তল সেন ওরফে বুবাই তোমাকে তোমার বাবা-মা খুঁজছেন...'

বালকটি মাইকের ঘোষণা শুনে জিজ্ঞাসু ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি নাম বলল?'

আমি বললাম, 'কুন্তল সেন ওরফে বুবাই। তোমার কি নাম?'

বালকটি ফিক করে হেসে ফেলল, তারপর বলল, 'আবার আমি হারিয়ে গেলাম।'

পরের কাহিনীটি অধিকতর জটিল। নবমীর মধ্যরাতে এক নবদম্পতি পুজো দেখতে বেরিয়েছে। ছেলের চোখে মোটা কাঁচের মাইনাস পাওয়ার চশমা। চশমা খুললে সে চোখে কিছুই দেখতে পায় না।

একডালিয়ার পুজোর ভিড়ের মধ্যে মধ্যে পথ করে নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর ধস্তাধস্তিতে ছেলেটির চোখ থেকে চশমা খসে পড়ে গেল। সে চশমা ওই ভিড়ের মধ্যে কুড়িয়ে তোলা অসম্ভব। তাছাড়া জনতার পায়ের চাপে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চশমাটি চুরমার হয়ে গেল।

ছেলেটি বুঝল চশমা পুনরুদ্ধারের কোন রকম আশা করা বৃথা। প্রায় অন্ধের মত বৌয়ের হাত ধরে সে ভিড়ের ধাক্কায় ধাক্কায় মণ্ডপ থেকে বহুকষ্টে,

কংক্ষণ পরে বেরিয়ে এল।

বাড়ি খুব দূরে নয়, কাছেই পণ্ডিতিয়ায়। কোন রকমে স্ত্রীর বাহু হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাস্তায় ঠোক্কর খেতে খেতে জনস্রোতের ঠেলাঠেলি সয়ে, সে এসে বাসার দরজায় কড়া নাড়ল।

বাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি হলেন ছেলেটির বিধবা জননী। তিনি এই শেষরাতেও ছেলে আর ছেলের বৌয়ের জন্য জেগে বসেছিলেন।

তিনি দরজা খুলে ছেলে আর ছেলের বৌকে দেখে কয়েকবার চোখ কচলিয়ে, 'হায় হায়' করে উঠলেন, 'খোকা তোর চশমা কি করলি? এ কি করেছিস! নবমীর নিশিভোরে নিজের বৌ ফেলে এ কার বৌকে নিয়ে চলে এলি।'

এসব পুরনো গল্পের পরে একটা নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলি।

পুরনো পাড়ার পুজোমণ্ডপে গেছি। এ পাড়ার, পুজোর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আমি একজন। সে পঁচিশ বছর আগে, এবার রজত জয়ন্তী।

পুজোমণ্ডপে আমি যাওয়ায় নতুন যুগের মাতব্বরেরা সবাই খুব খুশি। এরই মধ্যে একটি নিতান্ত নাবালক 'তারাপদদা, তারাপদদা' করে, আমার সঙ্গে নানা রঙ্গ রসিকতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে চিনি না, বাধ্য

হয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি? তোমাকে তো চিনতে পারছি না।'

নাবালকটি হেসে ফেলল, তারপর হাসতে হাসতেই বলল সে, 'কি করে চিনবেন তারাপদদা? আমি যে আপনি এ পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে জন্মেছি।' এরপর একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনার সেই কাণ্ডজ্ঞানের বছরে আমি জন্মেছি।'

কাণ্ডজ্ঞান। সেও সতেরো বছর হয়ে গেল। এ পাড়া ছেড়েছি সেও বিশ বছর।

বয়েস বেড়ে গেল। দিন হুই হুই করে চলে গেল। কত চাওয়া-পাওয়া। কত না-পাওয়া। কত পরিবর্তন, অদল-বদল। শুধু শরৎকাল বদল হল না। সেই সাদা মেঘ, সেই ঢাকের বাদ্যি, সেই নীল আকাশ, শিশির আর শিউলি। পুজো পুজো পূজার দিন।

মীনা বাজার

অনেকেই জানেন, আমার স্ত্রীর নাম মিনতি, ঘরোয়া ডাক নাম মীনা। অতীব বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী, কেউ কেউ ধরে নিতে পারেন বিগত যৌবন এই হাস্যকর লেখক প্রবীণা স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে এই রচনা লিখেছেন।

কিন্তু তা নয়। মীনাবাজার মিনতি রায় কিংবা মীনার কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।

গণতন্ত্র সম্পর্কে যেমন বলা হয় জনগণের জন্যে জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার; মীনাবাজার তেমনিই মহিলাদের জন্যে মহিলাদের দ্বারা মহিলাদের বাজার।

ধারণাটা মোগল আমলের। অসূর্যম্পশ্যা থেকে শত-সহস্র সূর্যানপশ্যা, পর্দানশীন এবং বেপর্দা মহিলারা সেই মীনাবাজারে কেনা-কাটা করবেন, তাঁদের সেই সাবলীল কেনাকাটায় কোনও পুরুষ কুদৃষ্টি বাধা দেবে না।

সিংহল সমুদ্রের মুক্তো, পারস্যের গালিচা, ঢাকার মসলিন, বসরার গোলাপজল, কান্দাহারের আতর কত কি বিক্রি হয় সেই মীনাবাজারে।

এই মীনাবাজার জড়িত মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং ভবিষ্যত ভারতসাম্রাজ্ঞী নুরজাহানকে নিয়ে একাধিক রোমান্টিক গল্প গত কয়েক শতাব্দী ধরে বহুল প্রচারিত।

একালে অবশ্য মীনাবাজারের আর প্রয়োজন নেই। বোরখাবাসিনী হারেম ও অন্তঃপুর রমনীরা, অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূ এবং অন্যান্য মহিলারা প্রায় সকলেই সসম্মানে জীবন-নাটক থেকে বিদায় নিয়েছেন। অবশ্য দুয়েকটি দেশে ব্যতিক্রম আছে। তাদের কাছে এখন সব বাজারই প্রায় মীনাবাজার।

মাছের বাজারে একটি ধারালো বটির দুই প্রান্তে মেছোনিদিদি আর কেনাদিদিমণি। অনেক জায়গাতে তরকারির দোকানেও একই দৃশ্য, ক্রেতা বিক্রেতা দু'জনেই মহিলা। মুদির দোকানেও প্রায় তাই হতে চলেছে, বহু ওষুধের দোকানেও।

শুধু মাছ বা আনাজ তরকারির দোকান নয়, বাজারে গিয়ে দেখুন এই পুজোয় সব বাজারই সত্যি মীনাবাজার। মহিলা বিক্রেতার সংখ্যার অপ্রতুলতা পুষিয়ে দিয়েছে মহিলা ক্রেতার ভিড়। পুরুষেরাও যে একেবারে নেই তা নয়, তবে তাঁদের ভূমিকা অতি নগণ্য, নিতান্তই গৌণ।

প্রথমে সেই কার্টুনসিদ্ধ কাহিনীটির কথা বলি। গত যুগের কাফি খাঁ, রেবতী, প্রমথ সমাদ্দার থেকে আমাদের আমল কখনো না কখনো এই কাহিনীটি কার্টুনে চিত্রবদ্ধ করেছেন।

ভদ্রমহিলা অনুগত পতিদেবতাকে সঙ্গে নিয়ে গড়িয়াহাট বা কলেজস্ট্রিটের একটা বড় দোকানে ঢুকেছেন পুজোর জামাকাপড় শাড়ি ইত্যাদি কিনতে।

ভদ্রমহিলা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একটা করে জিনিস কিনছেন আর পেছনে দণ্ডায়মান স্বামীর হাতে তুলে দিচ্ছেন। এইভাবে অবিরাম প্যাকেটের পর আরও প্যাকেট, আরও প্যাকেট, পিছনে চালান করে দিচ্ছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'। এ ক্ষেত্রেও প্রায় সেই রকমই হল।

জল বাড়ার সময় যেমন হয়, আস্তে আস্তে বুক পর্যন্ত, তারপরে গলা পর্যন্ত, তারপরে চিবুক পর্যন্ত, শেষে কপাল পর্যন্ত জল ওঠে। ভদ্রমহিলা পিছনের দিকে ফিরে একবারও দেখছেন না। শুধু প্যাকেটের ওপর প্যাকেট চাপিয়ে গেছেন।

অবশেষে আকোমর-মস্তক প্যাকেটাবৃত স্বামীকে মহিলা কনুই দিয়ে ঠেলে

ঠেলে দোকান থেকে বার করে রাস্তায় এসে দাঁড় করানো গাড়িতে স্বামীর শরীর থেকে প্যাকেটগুলো একে একে নামাতে লাগলেন। নামাতে নামাতে নাক পর্যন্ত এসে মহিলা চমকিয়ে উঠলেন, 'আপনি? আপনি কে? আপনিতো আমার স্বামী নন।' দোকানের ভিড়ে প্যাকেটের আড়ালে কখন যে স্বামী বদল হয়ে গেছে!

এর পরের গল্পটিও পুজোবাজারের।

মা নার্সিংহোমে। ঠাকুমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাতনি পুজোর বাজার করেছে। নাতনির বয়েস ছয়, ঠাকুমার বয়েস ছেষট্টি। ঠাকুমা খুব খুঁতখুঁতে, দশটা দেখে একটা কেনেন। বাড়িতে আনার পর আবার সেটাও পছন্দ হয় না, পরের দিন বা তারও পরে ফেরত দিতে চান। জিনিস ফেরত দেওয়া বা সেটা বদলিয়ে আনা যে কি ঝামেলা সেটা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

বলা বাহুল্য এই জিনিস কেনাকাটা থেকে বদলাবদলি সব সময়েই নাতনি ঠাকুমার সঙ্গী। মা যখন নার্সিংহোমে, খালি বাড়িতে কার কাছেই বা সে থাকবে।

সে যা হোক, পুজোর মধ্যেই মা নার্সিংহোম থেকে একটি শিশুপুত্র নিয়ে বাড়ি এলেন। দুদিন পর সেই বাচ্চাকে এক প্রতিবেশিনী দেখতে এসেছেন। তিনি সেই নাতনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাইকে দেখে খুশি হয়েছো?'

নাতনি চুপ করে আছে।

প্রতিবেশিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই পছন্দ হয়নি?' এবারও নাতনি চুপ।

প্রতিবেশিনী অবস্থাটা অনুমান করে বললেন, 'বোন হলে খুশি হতে?'

মেয়েটি ঘাড় কাত করে সায় জানাল।

প্রতিবেশিনী হেঁয়ালি করে বললেন, 'তা হলে নার্সিংহোম থেকে বদলিয়ে আনছো না কেন? ভাই রেখে বোন নিয়ে এসো।'

খুব গম্ভীর হয়ে মেয়েটি বলল, 'এখন কি আর বদলিয়ে দেবে? তিনদিন ব্যবহার করা হয়ে গেছে।'

এলোমেলো

সাধক কবি কালীমাতার উদ্দেশে গান রচনা করে দেবীকে অনুরোধ করেছিলেন, এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই।

লুটেপুটে খাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু এলোমেলো করে দেওয়ার ব্যাপারে আমি চিরদিনের একনম্বর এক্সপার্ট। আমার স্বর্গতা জননীকে প্ল্যানচেটে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন। আমার স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। উভয়েই বলবেন, এমন কাছাখোলা, অগোছালো লোক বিরল। হায়, বাংলাদেশের পাঠক, তুমি কাছাখোলা মানে বুঝতে পারছো না। আমি একটু বুঝিয়ে বলার মোটামুটি চেষ্টা করছি।

ধুতির দৈর্ঘ্য হল লুঙ্গির ডবল বা ততোধিক। লুঙ্গির একটা সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু ধুতি খোলামেলা ব্যাপার। তার সামনের অংশ কুচিয়ে কোঁচা হয়। আর পিছনের অংশ হয় কাছা। বলা বাহুল্য, এই কাছা খুলে গেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ধুতি পরিহিতের পক্ষে সে এক বেসামাল অবস্থা। আবার একথাও সত্যি যে ধুতি পরেন অথচ কাছা খুলে যায়নি বা যায় না, এমন লোক পাওয়া যাবে না। এ এক ভারি এলোমেলো ব্যাপার।

এ রকম এলোমেলো ব্যাপার নিয়ে খুব একটা বাড়াবাড়ি করা শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করবে। সুতরাং মানে মানে এলোমেলো কথিকায় চলে যাই।

অহঙ্কারী এবং যথারীতি মূর্খ এক ধনীনন্দন পার্কে বেড়াচ্ছেন কুকুর নিয়ে।

সেখানে তার পূর্বপরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। এই ভদ্রলোকের একাধিক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে এই ধনীনন্দন বিষয়ে। কুকুর নিয়ে ধনীনন্দন মুখোমুখি হতে ভদ্রলোক বললেন, 'এ কি, আপনি দেখছি একটা গাধার সঙ্গে বেড়াচ্ছেন।'

ধনীনন্দন বললেন, 'বড় সাইজের বটে। কিন্তু এটা গাধা নয়, এটা একটা কুকুর।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি তো আপনার সঙ্গে কথা বলিনি। আমি আপনার কুকুরের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

খুবই এলোমেলো ব্যাপার। কিন্তু এর মধ্যে একটা পরিষ্কার গোলমাল আছে। এবং আপনারা জানেন গোলমাল থাকছেই, বাস্তব জীবনে না হলেও, আমার রম্যরচনাবলীতে আমি প্রায়শই পুলিশের শরণাপন্ন হই। এবারও পুলিশঘটিত একটা কাহিনীতে যাই। এলোমেলো থেকে এলোমেলোত্তর কাহিনী।

সবাই জানেন পুলিশ পারেনা এমন কোন কাজ নেই। এই গল্পটি তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

এক কেষ্ট-বিষ্টু মানে ভি-আই-পি সাহেব মফঃস্বলের এক ডাকবাংলোয় উঠেছেন। সেখানে তাঁর গলার সোনার চেনটি খোয়া গেছে। তিনি চলে আসার সময়ে এই সংবাদটি স্থানীয় পুলিশকে জানিয়ে এলেন।

কিন্তু সেই ভি-আই-পি কলকাতার বাসায় ফিরে এসে দেখেন তিনি ভুল করে যাওয়ার সময়ে বাসার বাথরুমে দাড়ি কামানোর আয়নার সেটের সামনে গলার সোনার চেনটি ফেলে গেছেন।

বিবেকগ্রস্ত ভি-আই-পি সেই মফঃস্বলী থানায় ফোন করে একথা জানালেন।

এই সংবাদ শুনে থানার অফিসার বললেন, 'স্যার বলছেন কি? আমরা এর মধ্যে এগারো জনকে ধরে ফেলেছি।'

ভি-আই-পি স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'এগারো জনকে ধরেছেন?'

থানা অফিসার বললেন, 'তার মধ্যে তিনজন কলগার্ল। আপনি যে তিনদিন ছিলেন, সেই তিন রাতের মেয়েগুলো।'

ভি-আই-পি আঁতকে উঠলেন, 'এ্যাঁ?'

অদমিত থানা অফিসার বলে চলেছেন, 'এছাড়া আরও আটজন আছে, স্যার। ডাকবাংলোর বেয়ারা, পিয়ন, দারোয়ান। সামনের চায়ের দোকানের মালিক। তাছাড়াও আরও চারজন দাগী চোর।'

ভি-আই-পি তখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন, শুধু মুখে বললেন, 'ও।'

থানা অফিসার বললেন, 'জানেন স্যার, এরা প্রত্যেকেই আপনার সোনার চেন চুরি করেছে বলে স্বীকার করেছে। পাঁচজন তো এরইমধ্যে সোনার চেন ফেরত দিয়েছে।'

পুনশ্চ :

শেষ এলোমেলো গল্প

এক নবযুবক এই শীতের বাজারে একটা ঘোর কালো রঙের মাফলার কিনেছিল। পরের দিন ফিরে এসে বলল, 'একটা হালকা রঙের মাফলার দিন। এটা দেখলে আমার বান্ধবী খেপে যাচ্ছে।'

সপ্তাহ শেষে সেই যুবক এসে বলল, 'সেই কালো মাফলারটা আছে?'

প্রবীণ দোকানী বললেন, 'আপনার বান্ধবী বুঝি মত বদলেছেন?'

যুবকটি একটু ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক তা নয়। আসলে আমি আমার

বান্ধবী পালটিয়েছি।'

সংবাদে প্রকাশ

কলকাতা দূরদর্শনের প্রথম যুগে সংবাদ প্রচারের আগে ইংরেজী নিউজ শব্দটির প্রতিটি বর্ণমালাকে দিগ চিহ্ন হিসাবে দেখাতেন।

প্রথমে এন মানে নর্থ (উত্তর), তারপর ই মানে ইস্ট (পূর্ব), তারপর ডাবলু মানে ওয়েস্ট (পশ্চিম) এবং অবশেষে এস অর্থাৎ সাউথ (দক্ষিণ)। সংবাদের প্রারম্ভে এই হেড পিসটি দেখানো হত। বোধহয় কোথাও থেকে ধার করে বা চুরি করে এই মনোগ্রামটি রচিত হয়েছিল। এ রকম একটি মনোগ্রাম মৌলিক ভাবে উদ্ভাবন করার বুদ্ধি কলকাতা দূরদর্শনের তখনও ছিল না। এখনও নেই।

সে যা হোক নিউজ শব্দটি সম্পর্কে একদা এক বিখ্যাত সাংবাদিক বলেছিলেন, ইংরেজী নিউজ শব্দটি হল নিউ শব্দের প্লুরাল, মানে হল নতুন সব। সংবাদকে পুরনো হলে চলবে না, সব সময় নতুন হতে হবে।

সেই যে একটা গল্প আছে না, একদিন সুপ্রভাতে এক রাজনৈতিক নেতা এক প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের জাঁদরেল সম্পাদককে ফোন করেছেন, 'এ সব কি হচ্ছে মশায়!' বিস্মিত সম্পাদক জানতে চাইলেন, 'কি হচ্ছে?'

রাজনৈতিক নেতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল দূরভাষ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে, 'আপনার কাগজে এসব কি লেখা হয়েছে?'

'কি লেখা হয়েছে? সম্পাদক কিছুই অনুধাবন করতে পারছেন না।'

নেতা বললেন, 'এই মাত্র একজন আমাকে ফোন করে জানাল আপনার কাগজে নাকি আজ বেরিয়েছে যে আমি মদাপ, লম্পট, জোচ্চোর।'

নির্বিকার কণ্ঠে সম্পাদক বললেন,'আপনাকে কেউ ভুল জানিয়েছে। অন্য কোন কাগজে হয়ত ছাপা হয়েছে। আমরা পুরনো, বাসি খবর ছাপি না।'

এই প্রসঙ্গে সুরসিক জি কে চেষ্টারটনের একটি উক্তি স্মরণীয়।

সাংবাদিকের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন চেষ্টারটন, 'সাংবাদিক হল সেই ব্যক্তি

যে ঘোষণা করে যে মহামতি কখন মারা গেছেন, অথচ মহামতি বেঁচে আছেন এ খবরই লোকেরা জানত না।'

বাংলা অনুবাদে ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে হয়ে গেল বরং সাংবাদিক এবং সংবাদ বিষয়ে দু'একটা খোলামেলা হালকা গল্প বলি।

জরুরী অবস্থার সময়ে এক সাংবাদিক জেলে আটক ছিলেন। জেলের মধ্যে তাঁর কাছে খবরের কাগজ পৌঁছাত, কিন্তু জরুরী অবস্থার প্রকোপে কাগজে আসল খবর প্রায় কিছুই থাকতো না।

সাংবাদিক তাঁর এক বন্ধুকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর একটু রাখঢাক করে চিঠি মারফৎ জানাতে অনুরোধ করেন। অবশ্য তাঁর চিঠিতে তিনি আশঙ্কাও করেছিলেন যে, তাঁর ওই অনুরোধ হয়ত বন্ধুর কাছে পৌঁছাবে না, আর পৌঁছালেও বন্ধুটি যে খবর দেবেন তা তাঁর কাছে পৌঁছাবে না, জেল কর্তৃপক্ষ মধ্যপথেই সে সব সেন্সর করে দেবেন।

কয়েকদিন বাদে কারাপ্রধানের কাছ থেকে সাংবাদিক একটি পত্র পেলেন।

'আপনার অমুক তারিখের পত্রে আপনার জনৈক বন্ধুকে যা লিখেছেন তা মোটেই সত্য নয়। আমরা কখনও কোন চিঠি বা কাগজপত্র খুলে পড়ি না। আপনার অবগতির জন্যে জানালাম।

ইতি
ভবদীয়
জেল সুপার

পুনশ্চ :

প্রেসক্লাবে শোনা একটি কথোপকথন।

প্রথম সাংবাদিক ঃ তোমার যে বন্ধুর সঙ্গে আগে এখানে আসতে তাকে তো আজকাল আর দেখি না।

দ্বিতীয় সাংবাদিক ঃ কোন বন্ধু বলো তো?

প্রথম সাংবাদিক ঃ ঐ যে ভদ্রলোক, নামটা মনে পড়ছে না। ঐ যিনি তোমাদের কাগজে গতমাসে 'পথচারীদের নিরাপত্তা' বিষয়ে একটি চমৎকার নিবন্ধ লিখেছিলেন।

দ্বিতীয় সাংবাদিক ঃ খুবই খারাপ খবর তাঁর।

প্রথম সাংবাদিক ঃ কেন কি হয়েছে?

দ্বিতীয় সাংবাদিক ঃ সে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।

কাক

পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ বোধ হয় নেই, যে কখনও কাক দেখেনি। কাক মানুষের সবচেয়ে কাছের পাখি, সবচেয়ে পরিচিত পাখি। ঈশপের উপকথায়, হিতোপদেশের গল্পে, পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীতে, কাক কতকাল আগে থেকে রয়েছে।

সুপ্রাচীন হিন্দু ধর্মের পারলৌকিক ক্রিয়ায় কাকের একটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে। অশৌচকারী অশৌচের সময় কাককে হবিষ্যান্ন না খাইয়ে নিজে আহার গ্রহণ করতে পারে না।

রামায়ণ এবং মহাভারত, এই দুই মহাকাব্যেই কাকের কথা আছে। দুই মহাকাব্যের কাকই কোন সাধারণ কাক নয়। সর্বজ্ঞ, মহাদর্শী।

মহাভারতের কাক তো সেই বিখ্যাত ভূষণ্ডির কাক। ভূষণ্ডির কাকই বোধহয় মহাকাল, সে নররক্ত ছাড়া আর কিছু পান করে না। যত যুদ্ধই হোক, যত রক্তপাতই হোক তার তৃষ্ণা কিছুতে মেটে না। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ যুদ্ধের শেষে অহঙ্কার ভরে ভূষণ্ডির কাককে বলেছিল, 'এ রকম রক্তধারা কখনও দেখেছ? তোমার তৃষ্ণা নিশ্চয় মিটেছে।'

ভূষণ্ডির কাক তথা মহাকাল উত্তর দিয়েছিল, 'তৃষ্ণা মেটা দূরের কথা, ঠোঁট পর্যন্ত ভেজেনি।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর আমি সেই ভূষণ্ডির কাক তথা মহাকালের খোঁজ করেছিলাম। আমার পাপদৃষ্টিতে তার দেখা মেলেনি। দেখা হলে প্রশ্ন করতাম, 'এবার কি ঠোঁট একটু ভিজেছে?'

রক্তপাত থেকে এবার একটু দূরে যাই, একটি রক্তহীন দুঃখজনক গল্প বলি।

বাঙালীর ঘরের একটি ছোট মেয়ে তার নাম কৃষ্ণা। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটির গায়ের রং কালো, বেশ কালো। মেয়েটির বয়স এখন মাত্র পাঁচ বছর। কিন্তু এখন থেকেই তার অভিভাবকেরা তার কালোত্ব নিয়ে চিন্তিত, একদিন বিয়ে তো দিতে হবে। ঠাকুমা-দিদিমা, মাসি-পিসি সবাই কৃষ্ণাকে দেখলে বলেন, 'ও মা, মেয়েটা কি কালো হয়েছে?' এর মধ্যে যাঁরা একটু সহানুভূতিশীল তাঁরা আবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, 'ওর আর কি দোষ? ও বেচারা কি করবে? ওর মা আর বাবা দু'জনেই যে কালো।'

বেচারা কৃষ্ণা জ্ঞান হওয়া থেকে এরকম সব কথা শুনে আসছে। এই অল্প বয়সেই সে একটা স্কুলে পড়ে। আধুনিক শিশু মিলনায়তন। এখানকার শিক্ষয়িত্রীদের শিশুদের পরিবেশ ও প্রকৃতির বিষয়ে সচেতন করার গুরুদায়িত্ব।

এই পরিবেশ সূত্রে একদিন কাক নিয়ে আলোচনা হল। আলোচনার প্রথমেই একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কাক কি রকম দেখতে?'

সে বলল, 'কাক কালো।'

এরপর কৃষ্ণার পালা। তাকে একটা জটিল প্রশ্ন করা হল, 'কাক কালো কেন?'

কৃষ্ণা কিন্তু ঝরঝর করে এ প্রশ্নের চমৎকার এবং অভাবিত উত্তর দিল, 'কাক কি করবে? ওর তো কোন দোষ নেই। ওর যে মা কালো, বাবাও

কালো।'

পরশুরাম তাঁর একটা অসামান্য হাসির গল্পে একটি কালো মেয়ের কথা লিখেছিলেন। তার নাম তমিশ্রা। সে যখন বিহার মুলুকে চাকরি নিয়ে যায় স্থানীয় হিন্দিভাষীরা তার নামকরণ করেছিল 'কৌয়া দিদি', মানে 'কাক দিদি'; কাকের সঙ্গে তার চেহারার বা গায়ের রঙের মিল বলেও এই দেহাতি রসিকতা।

'কাক ডাকে কা-কা।
আগে অ পরে আ।।'

শিশুশিক্ষার গ্রন্থ প্রণেতাদের খুব প্রিয় বিষয় কাক। সুপরিচিত পাখি বলেই নয়, কাকের মধ্যে স্বরবর্ণের অ-আ, ব্যঞ্জনবর্ণের ক প্রথম বর্ণগুলি পাওয়া যায়।

একদা কোথায় যেন এক দুপুরে আমি আর স্বর্গত পূর্ণেন্দু পত্রী বসেছিলাম। কাছে একটা কাক বিলম্বিত লয়ে 'কাকা-কাকা-কাকা' করে ডাকছিল।

পূর্ণেন্দু আমাকে বললেন, 'শুনতে পাচ্ছিস?'

আমি বললাম, 'কি?'

পূর্ণেন্দু বললেন, 'ঐ কাক ডাকছে।'

আমি বললাম, 'অনেকক্ষণ ধরে কাকা, কাকা করে ডাকছে।'

পূর্ণেন্দু স্বভাবসিদ্ধ শিশুসুলভ হাসি হেসে বললেন, 'জানিস তো, কাকের মা, বাবা, দাদা, দিদি, মাসি, পিসি কেউ নেই। আছে শুধু কাকা। সারা দিন সেই কাকাকে ডেকে যায়।'

কাক সম্পর্কে শেষ কথা (এবং অবশ্যই শোনা কথা) এটা হল যে, কাকের মাংস খেলে নাকি পাগল হয়ে যায়। কথাটার সত্যতা বিচার করার আমি চেষ্টা করিনি। আপনারাও করবেন না।

তবে এক ভোজনরসিক একদা আমাকে বলেছিলেন, 'পুরো একটা কাকের মাংস খেতে যাবেন কেন? এক টুকরো কাকের মাংস সুক্তোর মধ্যে দিয়ে দেবেন। দেখবেন সুক্তোর তেতোর স্বাদ শতগুণে বর্ধিত হয়েছে।'

pathagar.net

অবাক কাণ্ড

সেই শিশুটির বিস্ময়ের বিষয়টি একবার স্মরণ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, আলোচ্য শিশুটি মহিলা শিশু, একটি নাবালিকা। সবাই জানেন এদের

কৌতূহল একটু বেশি। এই বালিকাটি একদিন কথায় কথায় তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মা তুমি কোথায় জন্মেছিলে?'

তার মা বলল, 'বরিশালে, তোর মামার বাড়িতে।'

বালিকাটি এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করল, 'বাবা কোথায় জন্মেছিল?'

তার মা বলল, 'সে তো তোদের দেশের বাড়িতে ফরিদপুরে।'

অবশেষে বালিকাটির আসল প্রশ্ন, 'আর আমি কোথায় জন্মেছি?'

তার মা বলল, 'সে তো তুই জানিস। তুই তো এই ঢাকা শহরেই জন্মেছিস, মিটফোর্ড হাসপাতালে।'

ছোট মেয়েটি এখন চোখ গোল গোল করে বলল, 'দ্যাখো কি আশ্চর্যের ব্যাপার।'

তার মা অবাক হয়ে বলল, 'এর মধ্যে আশ্চর্যের ব্যাপারটা কি ঘটলো?'

মেয়েটি বলল, 'আশ্চর্যের ব্যাপার নয়? কোথায় তোমার বরিশাল, কোথায় বাবার ফরিদপুর আর কোথায় এই ঢাকা। আমরা তিনজনায় কেমন করে একত্র হলাম। আমার তো অবাক লাগে।'

এই বালিকাটি খুবই কৌতূহলী কিন্তু অকালপক্ক নয়। একটু বেশি জানতে চায় এই যা।

অকালপক্ক বালিকার একটা পুরনো উদাহরণ হাতের কাছেই আছে।

তার আগে পশ্চাৎপট একটু ব্যাখ্যা করি। একটা বড় ফ্ল্যাট বাড়িতে পর পর দুটো প্রেম বিবাহ ঐ যাকে লাভ ম্যারেজ বলে, হয়ে গেল সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে। তার মধ্যে একটি বিয়ে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে।

এ নিয়ে যথারীতি মহিলা মহলে ফিসফাস, নানা রকম গুঞ্জন উঠেছে। সেসব গুঞ্জনধ্বনি বালক-বালিকাদের কানেও যাচ্ছে। অবশেষে চরম কৌতূহল নিয়ে একটা অকালপক্ক বালিকা একদিন তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মা, তোমার কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল?'

ভাতের হাঁড়ি উনুন থেকে নামাতে নামাতে তরুণী জননী বলল, 'এ আবার কি প্রশ্ন?'

মেয়েটি নাছোড় বান্দী, বলল, 'বলোই না, তোমার কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল?'

মেয়েটির মা এবার বলল, 'কেন তোর বাবার সঙ্গে।' এ কথা শুনে সেই

অকালপক্ক বালিকাটি গালে হাত দিয়ে, ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, 'ছি! ছি! এত জানাজানির মধ্যে!'

* * *

চল্লিশের দশকের বিখ্যাত কবি ছিলেন অশোক বিজয় রাহা। সুন্দর-মধুর ছন্দবাঙ্গনাময় কবিতা লিখতেন শান্তিনিকেতনবাসী এই কবি। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে একাধিক কবিতা আছে এই কবির। অশোক বিজয় রাহা অবাক কাণ্ডের একটি অতি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিলেন তাঁর একটি কবিতায়।

'অবাক কাণ্ড, আরে!
একখানি চাঁদ আটকে আছে
টেলিগ্রাফের তারে।'

আমাদের শৈশবে 'অবাক কাণ্ড' নামে একটি ছোটদের গল্পের বই ছিল, বইটি এখনও পাওয়া যায় কিনা জানি না। বইটির গল্পগুলোর কথা বিশেষ মনে নেই, লেখকের নামও মনে পড়ে না, কিন্তু বইটির চেহারা আবছা-আবছা মনের মধ্যে রয়ে গেছে।

পুনশ্চ ঃ

অবাক কাণ্ড শেষ করার আগে একটা বিলিতি অবাক কাণ্ডের উদাহরণ দিই।

গল্পটি অল্প কিছুদিন আগে একটা সংকলনে আমি পেয়েছি। স্বামী হত্যার দায়ে আদালতে সোপর্দ হয়েছেন এক মেমসাহেব। তীর ধনুক থেকে তীর ছুঁড়ে স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। মেমসাহেব নিজের দোষ কবুল করেছেন।

কিন্তু তীর দিয়ে কেন? ঘরে বন্দুক ছিল, রিভলবার ছিল—এসব থাকতে ঐ আদিম যুগের অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা কেন?

জজসাহেবের এই জিজ্ঞাসায় মেমসাহেব বললেন, 'ইয়োর অনার, ঘরে আমার ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে ছিল, গুলির শব্দ করে আমি তাদের ঘুম ভাঙাতে চাইনি।'

গল্পের গতি

গল্পের গতি সব সময় অনুধাবন করা যায় না। নদীর স্রোতের মতই কখন যে কোথায় কোন গল্প বাঁক নেবে অনুমান করা কঠিন।

গল্প যিনি লেখেন বা বলেন, তিনিও হয়তো খেয়াল রাখতে পারেন না, গল্প কোন দিকে গড়াচ্ছে। আবার অনেক চতুর গল্পকার আছেন যাঁরা সচেতনভাবেই গল্পটিকে একটি বাঁকাপথে ঘুরিয়ে দেন।

উদাহরণ হিসেবে দু'টি গল্প দেখা যেতে পারে। দু'টি গল্পই আত্মজীবনীমূলক, দু'টিই ধনবান ব্যক্তির গল্প।

খান চৌধুরী তাঁর ড্রয়িংরুমে বসে নতুন বন্ধুদের গল্পটা বলছিলেন, 'রাস্তায় একটা পিন পড়ে ছিল, সেই পিনটা কুড়িয়ে তুলে আমার কর্মজীবন শুরু করেছিলাম।'

এক উৎসাহী শ্রোতা স্বাভাবিক কারণেই জিজ্ঞাসা করলেন 'সেটা কি ব্যাপার?'

খান চৌধুরী বললেন,'তখন আমার উনিশ বছর বয়েস। একটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম। ইন্টারভিউ ভাল হয়নি, মন খারাপ করে বেরিয়ে আসছি, 'দেখি পায়ের সামনে একটা পিন পড়ে রয়েছে।'

শ্রোতাদের মধ্যে একটি প্রগলভ ছোকরা ছিল, সে বলে বসল, 'জানি গল্পটা।'

খান চৌধুরী বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুঞ্চন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি জানো?'

ছোকরা বলল, 'ঐ তো সেই গল্প। আপনাকে পিন কুড়োতে দেখে কোম্পানির ম্যানেজার আপনার সতর্ক দৃষ্টি এবং সচেতন মনোভাব দেখে নিজে এগিয়ে এসে আপনাকে চাকরি অফার করলেন।' .....

ছোকরাকে থামিয়ে দিয়ে খান চৌধুরী বললেন, 'এসব রদ্দি, বস্তাপচা গল্প বাদ দাও, শোনো ছোকরা, আমি যে পিনটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, সেটা

একটা বহুমূল্য ডায়মন্ড পিন, একেবারে খাঁটি হিরে। কেউই আমাকে কুড়িয়ে নিতে দেখেনি, তাহলে কি আর সেটা পেতাম।'

হতবাক হয়ে সেই ছোকরাটি জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

খান চৌধুরী সাহেব বললেন, 'তারপর, আর কি? পিনটি বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা পেলাম। সেই আমলের পাঁচ হাজার টাকা। যখন চালের মণ ছিল কুড়ি টাকা, সোনার ভরি ছিল আশি টাকা, এখনকার পাঁচ লাখ টাকার সমান। তাই দিয়ে প্রথম ব্যবসা জীবন শুরু।'

খান চৌধুরী সাহেবের গল্পের গতিটা প্রথমে অনুধাবন করতে পারা যায় নি। এর পরের গল্পটা রায়চৌধুরী সাহেবের। গল্পটা পুরনো, কিন্তু এমন একটা প্যাঁচ আছে যে শেষটা ধরা কঠিন।

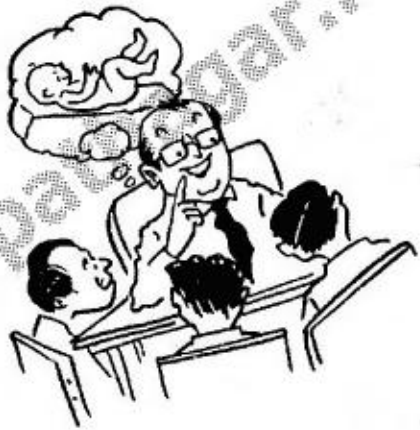

রায়চৌধুরী সাহেবও তাঁর বাইরের ঘরে বসে অতিথিদের সঙ্গে গল্প করছিলেন, আপনমনে করে যাচ্ছিলেন।

'বাবাঃ, সেদিন রাতে কি বৃষ্টি, কি জলঝড়, শীতের হাওয়ায় কি জোর।'

একজন প্রশ্ন করল, 'কবে স্যার?'

রায়চৌধুরী বললেন, 'সেটা একটা বড়দিনের, ক্রিস্টমাসের রাত। আমার গায়ে কোন জামা-কাপড় নেই, শীতে, ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছি। এই

শহরে আমি সেদিন প্রথম এলাম। কথা বলতে পারছি না। দাঁড়াতে পারছি না।'

একজন বয়স্য বললেন, 'আপনি তো বড়দিনেই জন্মেছিলেন। এই তো সেদিন আপনার জন্মদিনে আমরা এত খানাপিনা করলাম।'

রায়চৌধুরী বললেন, 'হ্যাঁ তুমি ঠিকই ধরেছো।' তখন সেই সবজান্তা বয়স্য বললেন, 'আপনি তো স্যার এই শহরেই জন্মেছেন বলে শুনেছি।'

রায়চৌধুরী এবার ঝেড়ে কাশলেন, বললেন, 'ঠিকই ধরেছো তুমি। আমি আমার জন্মানোর দিনের কথাই বলছি।'

পুনশ্চ ঃ

ইস্কুলের ক্লাসে দিদিমণি অর্থাৎ মিস অর্থাৎ আন্টি একে ছাত্রীকে বললেন, 'আচ্ছা বুলবুলি, আমি যদি তোমাকে এখন দুটো আম দিই, তারপর আবার টিফিনের সময় দুটো আম দিই, তাহলে সবশুদ্ধ ক'টা আম হবে?'

বুলবুলি মনে মনে যোগ কষে নিয়ে বলল, 'সাতটা আম হবে।'

দিদিমণি অবাক, 'সাতটা?'

বুলবুলি তার টিফিনের কৌটো খুলে তিনটে আম বের করে দেখিয়ে বলল, 'আপনি দিলেন দুটো, দুটো, চারটে আর এই তিনটে, সবশুদ্ধ সাতটা আমই তো হচ্ছে।'

রবিরস

সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য।' অর্থাৎ উপমার কথা যদি বলতে হয় তা হলে সে হল কালিদাসের উপমা। তেমনি বাংলায় যদি রসিকতার কথা বলতে হয়, সে হল রবীন্দ্রনাথের রসিকতা।

অবশ্য রসিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কোন কুসংস্কার ছিল না, তিনি নিজেই কবুল করেছিলেন, 'কোন দিনও এত বুড়ো, হব নাকো আমি, হাসি তামাশারে হবে ভব ছ্যাবলামি।'

লণ্ডন প্রবাসী বাঙালি সাংবাদিক, যিনি পঁচিশ বছরেরও বেশি কাল 'সাগর পারে' নামক বাংলা কাগজ লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেছেন, সেই হিরন্ময় ভট্টাচার্যের নতুন বই, 'রসিক রবীন্দ্রনাথ।' এর আগে তিনি লিখেছিলেন 'রসিক শরৎচন্দ্র।'

এখানে এটুকু ঋণ স্বীকার না করা খুব অনুচিত হবে যে, এই রম্য নিবন্ধের অধিকাংশ মালমশলাই হিরন্ময়বাবুর 'রসিক রবীন্দ্রনাথ' থেকে গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথের বাঘ শিকারের গল্প লিখেছেন হিরন্ময় ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্রনাথের তখন যুবক বয়েস। শিলাইদহে তাঁর কাছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এসেছেন। এমন সময় খবর এল গ্রামে বাঘ এসেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দুক নিয়ে বাঘ শিকারে চললেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সেটাই ভাল। অস্ত্র থাকলে বাঘের চেয়ে আমারই ভয় বেশি।'

বাঘ শিকারের সুবিধের জন্য বাঁশ দিয়ে একটা মাচা বাঁধা হয়েছে। সেই মাচার ওপরে চড়লেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথের খেয়াল হল, মাচার নিচে পায়ের জুতোজোড়াটা খুলে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের সে কী আফশোস, অসভ্য জানোয়ারটা আক্রমণ করতে এলে সেটাকে জুতোর দু'ঘা কষিয়ে অপমান করবেন সে উপায় রইল না।

বাঙালির ইংরেজি লেখা নিয়ে শিল্পী অসিত হালদারের একটি গল্প রবীন্দ্রনাথ অনেককে শুনিয়েছেন।

একজন বাঙালি জজের কাছে তাঁর এক পুরনো চাপরাসি এসেছে একটা সার্টিফিকেটের জন্য। জজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে হুকুম করলেন, 'আমার কোট-প্যান্ট-টাই, জুতো-মোজা সব বের কর।'

বাড়ির মধ্যে থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি বেরোচ্ছেন?'

জজ সাহেব উত্তর দিলেন, 'না, বেরোচ্ছি না। ইংরেজিতে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে, তাই ইংরেজের পোষাক পরছি।'

দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। দিলীপকে বললেন, 'ওহে, এই সেই মৈত্রেয়ী যে তোমার গান শুনতে চায়।' তারপর মৈত্রেয়ীকে বললেন, 'ওহে, এই সেই দিলীপ যে বান্ধবী বৎসল।' তারপর দু'জনকেই বললেন, 'তোমাদের আলাপের সেতু হলাম আমি। আলাপ করতে এগিয়ো একটু বয়ে সয়ে, সেতুটি বৃদ্ধ—বেশি দলন সইবে না।'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের খুব পিছনে লাগতেন। অনেক সময়ে তাঁর নামে যা-তা লিখতেন, এবং সে সব নোংরা সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথ এসব ব্যাপারকে খুব একটা পাত্তা দেননি, যদিও তিনি নিজেই লিখেছিলেন, 'কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকে।'

সে যা হোক একবার এই পাঁচকড়িবাবু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা করে খুব খারাপ কথা লিখলেন।

স্যার আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হলেন, 'আপনি সহ্য করেন, তাই বলে আমরা সহ্য করব না। এর একটা বিহিত করতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন, 'কি বিহিত করবে? মানহানির মামলা।'

স্যার আশুতোষ বললেন, 'মামলা না করলে পাঁচকড়িকে শায়েস্তা করা যাবে না।'

কবি বললেন, 'জন্মের সময় নিজের বাবা যার মূল্য ধার্য করেছিলেন মাত্র পাঁচটা কড়ি, তার বিরুদ্ধে কি মামলা আনবে।'

পুনশ্চ:

প্রখ্যাত প্র.না.বি অর্থাৎ প্রমথ নাথ বিশী একবার একটা কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে দিয়েছেন।

কবিতাটি হাতে পেয়ে কলম নিয়ে কবি সেটা সংশোধন করতে বসলেন। অনেক কাটাকুটির শেষে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ প্র.না.বি কে ফেরত দেওয়ার পর কবিতাটির অবস্থা দেখে প্র.না.বি বললেন, 'একটা সংশোধন বাকি আছে।' তারপর রবীন্দ্রনাথের সম্মুখেই কবিতার ললাটে প্রমথ নাথ বিশী নামটি কেটে সেখানে লিখে দিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

ভাষাতত্ত্ব

অনেকদিন জীবজন্তু বিষয়ে কিছুই লেখা হয়নি। মানুষ-মানুষ করেই সময় কেটে যাচ্ছে।

এবার একটু জীবজন্তুর দিকে দৃষ্টি ফেরাই।

আজগুবি গল্প আরম্ভ করার আগে একটা সত্যি ঘটনা বলি। ঘটনাটি আমার জন্ম হওয়ার গল্প। তা হোক, প্রিয় পাঠক, প্রিয়া পাঠিকে, আমি কিন্তু জেনে গেছি আমি একটু জন্দ হলে, একটু অপদস্থ, একটু হেনস্থা হলে আপনারা খুব খুশি হন।

বালিকাটির বয়েস মাত্র চার কিংবা কম বেশি। এই নাবালিকা বালিকা আমার প্রতিবেশীর নাতনি। সে একদিন এসে ঘোষণা করল, 'জানো দাদু, আমার বেড়ালটা নিজের নাম বলতে পারে।'

কোন অজ্ঞাত কারণে এই বালিকাটি আমাকে দাদু এবং আমার স্ত্রী মিনতিকে মাসি বলে। এর বিপরীত যদি হত, যদি সে আমাকে মামা এবং মিনতিকে দিদা বলত তাহলে কি কাণ্ড হত, সে বলা কঠিন।

সে যা হোক, উক্ত বালিকাটি আমাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে বেড়ালের নিজের নাম বলা শোনাতে। বাইরের ঘরে বেড়ালটাকে আমার সামনে নিয়ে আসতে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মার্জার মহোদয়, আপনার

নাম কি?'

মার্জার মহোদয় স্বভাবোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে একবার মুখ তুলে আমাকে দেখে কিঞ্চিৎ গোঁফ সঞ্চালন করে একটু হাই তুলে বললেন, 'মিউ।'

আমি বালিকাটিকে বললাম, 'কই এ তো নিজের নাম বলছে না।'

বালিকাটি বলল, 'ওই তো বলছে, মিউ।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'মিউ?'

সপ্রতিভ বালিকা বলল, 'তাই তো বলবে। ওর নাম যে মিউ।'

এবার আজগুবি গল্প। গল্পগুলো এতই উৎকৃষ্ট যে আমি বারংবার লেখার লোভ সম্বরণ করতে পারি না।

বেড়ালের ভাষা শিক্ষা বিষয়ক এই গল্পদুটি একটু প্রতীকধর্মী এবং বিভিন্ন উপাখ্যানে নানা আকারে পাওয়া যায়।

একটি বেড়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল মাতৃভাষা নয় এমন কোন ভাষা শিক্ষা করতে। বছর কয়েক পরে সে ফিরে এলে সবাই তাকে প্রশ্ন করল, 'কি ভাষা শিখলে? কই আমাদের শোনাও দেখি, কি ভাষা শিখে এলে?'

এই অনুরোধ শুনে বেড়ালটি লেজ খাড়া করে দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল।

সবাই অবাক! এ আবার কি?

বেড়ালটি তখন গর্বিতভাবে ঘোষণা করল যে সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুকুরের ভাষা শিখে এসেছে।

পরবর্তী আজগুবি গল্পটিও এই ভাষাবিদ মার্জারটিকে নিয়ে।

এই বেড়ালটি তার বান্ধবীর সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়, যেমন হয়, একটা বদমাইশ কুকুর তাদের তাড়া করে আসে। বেড়ালের বান্ধবী দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশের বাড়ির দেয়ালে উঠে পড়ে।

আমাদের ভাষাজ্ঞানী বেড়ালটি কিন্তু যে কুকুর তাড়া করতে এসেছে, সে তাকে উল্টে কুকুরের মতো 'ঘেউ-ঘেউ' করে তাড়া করে গেল। প্রাজ্ঞ কুকুরটা কস্মিনকালেও এরকম তাজ্জব ঘটনার সম্মুখীন হয়নি। একটা সামান্য বেড়াল কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করছে এ দৃশ্য তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। সে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল।

পুনশ্চ :

বহুকাল আগে আমার দিদিমা পাড়ার জমাদারকে একটা সিকি দিয়ে বলেছিলেন, একটি অত্যাচারী বেড়ালকে অন্য পাড়ায় ফেলে দিয়ে আসতে।

জমাদার বেড়ালটি ফেলে দিয়ে আসে এবং দুদিন পরে দিদিমা প্রদত্ত সিকিটি ভাঙাতে গিয়ে দেখে যে সেটা অচল। তখন সে সিকিটা নিয়ে দিদিমার কাছে আসে। এসে অভিযোগ করে, 'আপকো চৌ আনি নেহি চলতা হ্যায়। উ চৌ আনি অচল হ্যায়।'

দিদিমা একথা শুনে খুব চটে যান। জমাদারকে ধমকিয়ে বলেন, 'চৌ আনি অচল হ্যায় তো ক্যায়া হ্যায়? তুম যে বিল্লি ও পাড়ামে ফেকা ও বিল্লিভি চলা আয়া হ্যায়।'

ড্রাইভিং

সুকুমার রায় লিখেছিলেন, 'তুমি যে আমার কোন চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখিনি।'

কেউ বিশ্বাস করবেন না জানি, তবু বলি, আমিও গাড়ি চালাতে পারি এবং সুকুমার রায়ের ভাষায় বলতে পারি, 'চালাতে পারি, চালাই না। তার একমাত্র কারণ আমার কোন ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।'

আমার সরকারি চাকরির প্রথম যুগে আজকের মতো এত অ্যাম্বাসাডার, মারুতির ছড়াছড়ি ছিল না। বলা উচিত গাড়িই ছিল না। বড় বড় কর্তারাও অনেকে বাসে বিশেষ করে ট্রামে অফিসে যাতায়াত করতেন।

তবে জিপগাড়ি ছিল প্রায় প্রত্যেক অফিসেই। কলকাতায় এবং মফঃস্বলেও, একেবারে ব্লক অফিস পর্যন্ত। জিপের সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসাই ছিল কৌলীন্য। জিপে উঠলে, সঙ্গে ওপরওলা কেউ না থাকলে আমরা ওই সামনের সিটেই বসতাম। ড্রাইভারের সিটের পাশে বসে গাড়ি চালানো দেখে ড্রাইভিংয়ের ব্যাপারটা আমার বেশ রপ্ত হয়ে যায়।

সেই সময় আমি স্থির করি যে আমি একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স নেবো, যদিও তখন আমার নিজের কোন গাড়ি ছিল না, অদূর ভবিষ্যতে গাড়ি হবে এমন কোন ক্ষীণ সম্ভাবনাও ছিল না।

সে যা হোক, আমার এক বন্ধুর খ্যাপাটে গোছের এক মামা তখন মোটর ভেহিকলসে উচ্চবর্গীয় আধিকারিক। তাঁর কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্যে গেলাম। তিনি আমার কথা শুনে অধস্তন একজনকে ডেকে বললেন, 'এই ছোকরাকে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স করে দিন।'

আমি শুনে বললাম, 'আমাকে ড্রাইভিং টেস্ট দিতে হবে না?'

ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে বললেন, 'ড্রাইভিং টেস্ট নিয়ে কি হবে? তুমি চালাবে গাড়ি, তুমি লোক চাপা দেবে, তুমি মার খাবে, তুমি জেল খাটবে। গাড়ি চালাতে না জানলে কি তুমি গাড়ি চালাতে যাবে?'

প্রশাসনিক সমস্যার এমন দার্শনিক সমাধান হতে পারে তখনো জানতাম

না।

* * *

গাড়ি চালানোর নানা ঝক্কি। বহুৎ ঝামেলা। নিজে ভাল চালাতে জানলেই হবে না। পথে আর যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁরা কেমন চালাচ্ছেন সে ব্যাপারটাও খুব প্রাসঙ্গিক।

এক ভদ্রলোক খুবই সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এমন সময়ে বড় রাস্তার মোড়ের কাছে হঠাৎ পিছন দিক থেকে একেবারে বেলাইনে এসে একটা গাড়ি সজোরে ধাক্কা দিলো।

ধাক্কা দেওয়ার পরই পিছনের গাড়ির ড্রাইভার, এক ভদ্রমহিলা, নেমে এসে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, 'আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করবেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার কোনো ভুল হয়নি। আমারই ভুল হয়েছে।'

ভদ্রমহিলা অবাক, 'আপনার আবার কি ভুল হল?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি আপনাকে আগের মোড়েই লক্ষ্য করেছি। তখনই বুঝেছিলাম আপনার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। আমার আগেই উচিত ছিল, পাশের কোনো গলিতে লুকিয়ে পড়া।'

এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমি একবার শহরতলিতে একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলাম, তিনিই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। রাস্তার ধারে পোলের ওপরে উঠে টেলিফোন কিংবা ইলেকট্রিকের মিস্ত্রিরা লাইন সারাচ্ছিলো। ভদ্রমহিলা গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাঁদের চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'নেমে আসুন, নেমে আসুন। কোনো ভয় নেই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'দেখছেন না, ওরা **আমার গাড়ি চাপা পড়বে ভয়ে** থামের ওপরে উঠে বসে আছে।'

পুনশ্চ:

এ গল্প অনেকদিন আগেকার।

একদিন পার্কে বেড়াতে গেছি, দেখি একটি বছরখানেক বয়েসের নাদুসনুদুস বাচ্চা পার্কের ঘাসের ওপরে থপথপ করে হাঁটছে। মাঝেমধ্যে তাল সামলাতে পারছে না, মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে। আবার তখনই উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার হাঁটছে, পড়ে যাচ্ছে।

এই রকম করতে গিয়ে শিশুটি পার্কে বেড়াতে আসা ঘাসের ওপরে বসে থাকা দু-একজনের ঘাড়ে গিয়েও পড়ছে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারছে না। কারণ, কে যেন বুদ্ধি করে হুঁটনবিদ্যায় শিক্ষানবিশ মানবের কণ্ঠে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে একটি চৌকো পিচবোর্ড, তাতে লাল কালি দিয়ে লেখা রয়েছে L (ইংরেজি এল অক্ষর), যেমন লেখা থাকে শিক্ষানবিশ চালকের মোটর গাড়ির নম্বর প্লেটের পাশে।

ঘুম

সেদিন মাঝরাতে ঘুমোতে ঘুমোতে গড়িয়ে আমি বিছানা থেকে পড়ে গেলাম। বেশ বড়, পাঁচ বাই সাত হাত মাপের খাট। আমার এই খাট থেকে আমি গড়াতে গড়াতে পড়ে গেলাম। এ ব্যাপারটা আমার কাছে যেমন

গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি অন্যদের কাছে নিশ্চয়ই কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পড়ে যাওয়ার পর অবশ্যই আমি যথেষ্ট চিৎকার-চেঁচামেচি করে বাড়িশুদ্ধ এমনকি পাড়াশুদ্ধ লোককে ওইরকম অসময়ে ঘুম থেকে তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু লোকে কি বলবে, বিশেষ করে আমার স্ত্রী যিনি আমার স্থূলত্ব বিবেচনা করে বিয়ের পুরনো ডবলবেডের খাট আমাকে একলা ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর ক্রোধ কেমন হবে, সেটা অনুমান করে আমি নিঃশব্দে এই পতন মেনে নিলাম।

কোনোরকম উঠবার চেষ্টা করলাম না। শুয়ে শুয়ে প্রথমে বুঝতে চেষ্টা করলাম আমার এই কুমড়ো-পটাশ দেহের কতটা ক্ষতি হয়েছে।

বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ব্যথা, বেদনা কিংবা যন্ত্রণা বিশেষ বোধ করছি না। বিছানার থেকে ভূমিশয্যা মোটেই কষ্টকর মনে হচ্ছে না। খাটের ওপর থেকে একটা বালিশ টেনে নিয়ে মাথায় দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে খটকা লাগল, আমি এখানে শুয়ে কেন?

তারপর ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল। এখনও ঘুম থেকে কেউ ওঠেনি। এই সুযোগে সকলের অগোচরে আবার খাটে উঠে গেলাম। ভেবেছিলাম কোমরে বা কাঁধে কিংবা নিদেনপক্ষে হাঁটুতে বা কনুইতে তীব্র যন্ত্রণা বোধ

হবে খাটে ওঠার সময়। কিন্তু কিছুই হল না।

বাড়িতে কাউকে কিছু বললাম না, কিন্তু দুদিন পরে আমার শুভানুধ্যায়ী এবং সব বিষয়ে পরামর্শদাতা জজসাহেব বন্ধুকে পুরো ঘটনাটা বললাম।

তিনি হেসে বললেন, 'এটা কোনও ব্যাপারই নয়। আমি তো নিয়মিত খাট থেকে পড়ে যাই। মাসে-দু'মাসে অন্তত একবার।' তারপর একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আমি যা করেছি তাই করো।'

তিনি যা করেছেন তা'ও বললেন। মোটা কার্পেট দিয়ে খাটের চারপাশ ঘিরে রেখেছেন, খাট থেকে পড়ে গেলে কুসুমকোমল শয্যায় পড়েন।

ফোলা গালিচা কেনার আর্থিক ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া বাড়িতে এ নিয়ে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তাই ব্যবস্থাটি এড়িয়ে গিয়েছি। তবে আজকাল যথাসাধ্য সাবধানে খাটের মাঝখান আঁকড়িয়ে ঘুমোই।

আমার মনে পড়ে আমাদের কালীঘাট বাড়ির তন্দ্রা নামে বেড়ালীর কথা। কথায় কথায় তার তন্দ্রা আসত। যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ত। তন্দ্রা একদা আমাদের কাঠের আলমারির মাথায় উঠেছিল ইঁদুর তাড়া করে। যথারীতি, ইঁদুর ধরা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কিন্তু আলমারির মাথায় স্থির চিত্তে অচঞ্চল দেহে ইঁদুর শিকারের চেষ্টায় অবশেষে তার ঝিমুনি এসে যায়। দু'বার গড়িয়ে তারপর তন্দ্রা সাতফুট নিচে পড়ে।

আমরা যারা দৃশ্যটি অবলোকন করছিলাম, ভাবলাম, এরপর থেকে সারাজীবন তন্দ্রা ল্যাংচাবে। আমাদের সেই আশঙ্কা পণ্ড হল যখন দেখলাম শ্রীমতি তন্দ্রা, দীর্ঘ পতনের পরেও বসে বসে ঝিমোতে লাগল।

আমি ধরে নিয়েছিলাম এ ঝিমুনি কাটতে বহুদিন লাগবে। কিন্তু হঠাৎ সামনে দিয়ে একটা আরশোলা ছুটে যেতে দেখে এক লাফ দিয়ে সেটাকে ধরে ফেলল। তার আচার আচরণ স্বতঃস্ফূর্ত, পতনের কোনও গ্লানি লেগে নেই, কোনরকম ল্যাংচানোর প্রশ্নই আসে না।

একটা সামান্য বেড়ালীকে কুৎসা কন্টকিত করার মতো খারাপ মানুষ আমি নই। বিশেষ করে ঘুমের ব্যাপারে আমার সেই অধিকারও নেই। নিজের কথা আরেকটু বলি।

একটি প্রাচীন কাহিনী। আমাদের কালীঘাটের পুরনো বাড়ির মহিম হালদার স্ট্রিট পাড়ার নব্য অধিবাসীরা পুরনো বাসিন্দাদের কাছে যাচাই করে নেবেন।

একটা পুরনো, ভাঙা দোতলা বাড়িতে একসময় আমি একাই থাকতাম। বেলা করে ঘুম থেকে উঠতাম। বিশেষ প্রয়োজন হলেও কেউ ডেকে দেওয়ার ছিল না। সেই সময়ে কোনো কোনো দিন, রাতে শুতে যাওয়ার আগে আমি বাড়ির বাইরের দরজায় এইরকম একটা নোটিশ দিতাম।

'কাল সকালে আমার বিশেষ জরুরি কাজ। আপনি যেই হোন, দয়া করে সাতটার সময়, এই নোটিশ দেখামাত্র কলিং বেল বাজান, বাজিয়ে যান, বাজিয়ে যান।'

যদি এর পরেও আমি ঘুম থেকে না উঠি আবার সাড়ে আটটার সময় কলিং বেল বাজাবেন, তারপর আবার দশটায়।'

পুনশ্চ:

আজকাল ভাগ্যবান বহু লোক ঘুমের মধ্যে নিরাপদে, নিশ্চিন্তে মারা যাচ্ছেন। তাঁদেরই একজন, আমাদের ভুলোমন প্রফেসর সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যে মরে গেলেন। তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত পাশে শুয়ে থেকেও কিছু টের পাননি। টের পেতে বললেন, 'কি বলব, যা ভুলোমন ছিল লোকটার, হয়ত ঘুমের মধ্যে নিঃশ্বাস নিতেই ভুলে গিয়েছিলেন।'

ঘোড়ারোগ

রেসুরে বা রেসুড়ে মানে হল যে ব্যক্তি রেস খেলে, অর্থাৎ ঘোড়াদৌড়ের বাজি খেলে।

রেসুরে হল দুর্বল চরিত্রের মানুষ। যে জুয়া খেলে ভাগ্য ফেরাতে চায়। ব্যাপারটা অবশ্যই ঘটে না। দু'য়েকবার দু'য়েক বাজি রেস কেউ কেউ অবশ্য জেতে। কিন্তু হারাটাই বেশি, সেটাই প্রধান।

জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়েছে, বাড়ি-গাড়ি বেচে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, মহারাজা

যুধিষ্ঠিরের মতো রাজ্য হারিয়ে বনবাসে চলে গেছে—এমন লোকের সংখ্যা বিস্তর। কিন্তু রেস বা জুয়া খেলে কেউ বড়লোক হয়েছে, আমার এই বয়েসে আমি দেখিনি। অবশ্য শেয়ার বাজারের ফাটকাবাজি করে কেউ কেউ হয়ত সাময়িক লাভবান কিন্তু অনেক সময় কোন একটা বড় ধাক্কা এলে তারাই প্রথমে চিৎ হয়ে পড়ে।

সে যাহোক, সামাজিক মানুষ হিসেবে ঐ রেসুরেদের আমরা মোটেই পছন্দ করি না। কিন্তু একজন শব্দবিলাসী হিসেবে রেসুরে শব্দটি আমাকে ভাবায়।

'রেস' (Race) শব্দটি ইংরেজী, বাংলায় রেস খেলা মানে ঘোড় দৌড় খেলা, এ খেলা যে খেলে সে হল রেসুরে। একটি ইংরেজী শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রেফিক্স জুড়ে একটি অর্থবহ শব্দ তৈরি হয়েছে। চাকরি থেকে যেমন চাকুরে, শহর থেকে যেমন শহুরে, তেমনই রেস থেকে রেসুরে।

অনুমান করি শব্দটির বয়স দেড়শো বছরের বেশি নয়। সম্ভবত কলকাতার ইঙ্গভঙ্গ সংস্কৃতির বড়দিন, বলডান্স, কার্নিভাল, ঘোড়দৌড়ের আদি যুগে শব্দটি চালু হয়।

এইরকম নিরস ভূমিকার পর একটা অত্যন্ত মজার গল্প বলতে হয়।

মজাটা ঐ রেসুরেকে নিয়েই।

এক ভদ্রলোককে চিনতাম, তিনি তাসের জুয়ায় অপ্রতিরোধ্য ছিলেন। তিনিই একদা রেস খেলে ঘোড়দৌড়ের বাজিতে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

ভদ্রলোক এমনিতে ভাল মানুষ। তিনি সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে পরিচিত জনের কাছ থেকে অল্প অল্প করে অর্থ ঋণ নিচ্ছিলেন এবং তাসের জুয়া খেলে আবার ভাগ্যোদ্ধারের সফল প্রয়াস চালাচ্ছিলেন।

এক সন্ধ্যায় ভদ্রলোককে একাকী পেয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি তাসের জুয়ায় এত ভাল অথচ ঘোড়দৌড়ের বাজিতে হেরে যান।'

অনুচ্চকণ্ঠে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'কি করব ভাই? তাসের মত ঘোড়াগুলোকে যে সাফল করতে পারি না।'

চমৎকার স্বীকারোক্তি। আসলে কোনরকম জুয়া খেলাই সম্পূর্ণ ভাগ্যনির্ভর নয়। এর মধ্যে অনেকটাই জাল-জুয়াচুরি থাকে।

এবং এটা আজকের ব্যাপার নয়। সেই যে যুধিষ্ঠিরের কথা বললাম, মহাভারতে তিনি শকুনির সঙ্গে যে দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে সর্বস্বান্ত,

অপদস্থ এবং নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাঁর যৌথপত্নী দ্রৌপদীকে পর্যন্ত বাজিতে হেরে বিবসনা হতে হয়েছিল। শাস্ত্রিকারেরা অনুমান করেন, সেই প্রাগৈতিহাসিক দ্যূতক্রীড়ায় চাতুরির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল বিপক্ষ অর্থাৎ কৌরবপক্ষ দুর্যোধনের দিক থেকে।

ইংরেজী ভাষায় একটা কথা আছে, **'Fast women and slow horses'** যার অর্থ হল 'দ্রুতগতি রমণী এবং শ্লথগতি ঘোড়া'।

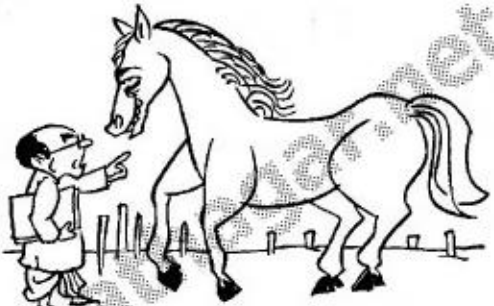

বলা বাহুল্য, এটা এক হতভাগ্য মানুষের স্বীকারোক্তির একটি পঙক্তি। তিনি তাঁর আর্থিক অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করে সেই স্বীকারোক্তিতে চপলা রমনী এবং অচঞ্চল অশ্বদের দোষারোপ করেছিলেন। যে সমস্ত রমনী এবং অশ্বের প্রতি তিনি আসক্ত ছিলেন তারা তাঁকে পর্যাপ্ত ডুবিয়েছে। মহিলারা অতিরিক্ত ছুটেছে মানে খরচ করিয়েছে। এদিকে যে সব ঘোড়ার ওপরে তিনি বাজি ধরেছিলেন, সেগুলো মোটেই ছোটেনি। ফলে অর্থ ব্যয় হয়েছে রমনীদের জন্য অপর্যাপ্ত আর জুয়ায় ক্ষতি হয়েছে অসামান্য। দুইয়ে মিলে আজ তিনি যাকে বলে পথের ভিখিরি।

বাংলায় 'গরিবের ঘোড়ারোগ' বলে একটা প্রবাদ আছে। রেস খেলা সেই ঘোড়ারোগ। এ রোগে গরিবের মৃত্যু অনিবার্য।

পুনশ্চ:

আদি এবং অকৃত্রিম গোপাল ভাঁড়ের এই ঘোড়ারোগের একটি গল্প আছে। সেখানে ঘোড়ারোগ অবশ্য অন্যরকম। ঘোড়ারোগের কাহিনীটি একটু ছোট করে, আমার মতো করে বলছি।

রহিম কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাওয়ার সময় তার দুধেল গরুটি প্রতিবেশী করিমের কাছে রেখে যায়। ফিরে এসে রহিম যখন গরুটি প্রতিবেশীর কাছে ফেরত চায়, প্রতিবেশী জানায়, গরুটি মরে গেছে। আসলে সে গরুটা বেচে দিয়েছিল।

সত্যিই তার গরুর কি হয়েছিল সে বিষয়ে রহিমের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তখন করিম রহিমকে গো ভাগাড়ে নিয়ে যায়। দুঃখের বিষয় সেখানে কোন গরুর কঙ্কাল ছিল না, একটা ঘোড়ার কঙ্কাল পড়েছিল। সেই কঙ্কাল দেখিয়ে করিম বলে, 'এই দ্যাখো, তোমার গরুর কঙ্কাল।'

রহিম মানবে কেন, সে বলল, 'কিন্তু এ তো দেখছি একটা ঘোড়ার কঙ্কাল।'

তখন করিম সাফাই গাইল, 'আরে ভাই, ঐ ঘোড়ারোগেই তো তোমার গরু মারা গেছে।'

অভিনয়

দূরদর্শন এ টি এন কেবল চ্যানেলের কল্যাণে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা কলকাতায় বসে ঢাকার প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছি।

বাংলাদেশের পাঠকদের খুশি করার জন্য বলছি না, সত্যিই দেখে ভাল লাগছে। আলাদা স্বাদ, আলাদা মেজাজ, অন্য পৃথিবী, কারও কারও মুখের ভাষায় একটু টান আছে, তবে সেও খুব মধুর।

প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিলাম, 'শিল্পী' ধারাবাহিকের নায়িকাকে দেখে, যে মাতঙ্গিনী হাজরার জীবন কাহিনী নিয়ে নাটক করার স্বপ্ন দেখে। মেয়েটি এক কথায় অনবদ্য।

আমাদের মন আরও কেড়ে নিয়েছে বিপাশা হায়াত। এমন ঝলমলে, সুদর্শনা নায়িকা শুধু ঢাকা-কলকাতায় নয়, মুম্বাই-চেন্নাই-লাহোরেও বিরল।

আরেক জনের কথাও বলি। সে হল শমি কায়সার। ইংরেজিতে বলে গার্ল নেক্সট ডোর (Girl next door), পাশের বাড়ির মেয়েটি। অনেকদিনের চেনাজানা, আপন আপন ভাব শমির অসামান্য অভিনয় তাঁকে আমাদের মনের মধ্যে নিয়ে এসেছে। সে যেন যে কোন মুহূর্তে 'আঙ্কল' কিংবা 'চাচা' বলে আমাদের সদর দরজায় এসে কড়া নাড়বে।

পুরুষ চরিত্রাভিনেতাদের বিষয়ে ভাবান্তরে দীর্ঘ আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। শুধু একটা সংক্ষিপ্ত কথা বলি, প্রবীণ অভিনেতারা নবীনদের চেয়ে অনেক বেশি জবরদস্ত এবং আলাদা করে ব্যক্তিগতভাবে বলি অনেকদিন পরে আমাদের পীযূষ, শ্রীযুক্ত পীযূষ বন্দোপাধ্যায়কে দেখে খুব ভাল লাগল।

এবার ধারাবাহিকগুলোর কথাও অল্প কিছুটা বলি।

কিছুদিন কলকাতা ছিলাম না। ধারাবাহিক দর্শনে কিছুটা ছেদ পড়েছে। ফিরে এসে দেখি এর মধ্যে দুয়েকটা নতুন কাহিনীমালা প্রবেশ করেছে।

আমরা নিয়মিত দেখি 'সাত নম্বর বাড়ি', 'সাত-সতেরো' এবং 'নক্ষত্রের রাত'। হুমায়ূন আহমেদের 'নক্ষত্রের রাত' একটি অবিস্মরণীয় প্রযোজনা, কদাচিৎ এমন চমৎকার সিরিয়াল দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি।

* * *

আমাদের বাল্যকালে টাঙ্গাইল শহরে খুব রমরমা ছিল থিয়েটারের। মানময়ী গার্লস স্কুল, সিরাজদৌল্লা, টিপু সুলতান, পি ডবলু ডি, বঙ্গে বর্গী।

টাঙ্গাইলের করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের বয়স প্রায় একশ' বছর হতে চলল। টিনের চালার নিচে প্রাচীন টিনের চালাটি এখনও নিশ্চয় আছে, তবে বহুকাল হল সিনেমা হল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বহুকাল আগের টাঙ্গাইলের থিয়েটারের একটা গল্প মনে পড়ছে। আমাদের শহরে এক মদ্যপ কিন্তু দুর্দান্ত অভিনেতা ছিলেন। তবে পরিচালকও অতিশয় রাশভারি।

কি একটা নাটকের রিহার্সালের সময় সেই মদ্যপ নায়ক পরিচালককে বলেছিলেন, 'কাকাবাবু, মদ খাওয়ার সিনে আপনি যদি লেমনেডের বদলে

আসল মদ খেতে দেন তা হলে এমন অভিনয় করব যে লোকে ভুলতে পারবে না।' প্রবীণ কাকাবাবু এ কথা শুনে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে মদের সিনে মদ দেব। কিন্তু শেষ দৃশ্যে বিষ পানের সময় আসল বিষ খেতে হবে।'

প্রবন্ধধর্মী এই রচনায় আমার চিরাচরিত রসিকতাগুলোর সুযোগ খুব কম। তবু নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আরেকটা গল্প বলি।

কলেজে পড়ার সময় আমাকে একটা নাটকে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হয়। রীতিমতো আধুনিক নাটক, আমার ভূমিকা ছিল জনৈক মৃত মানুষের। মঞ্চে মৃত মানুষটি পড়ে থাকবে, তাকে ঘিরে মূল নাটকটি অভিনীত হবে।

প্রথম দিনে, রিহার্সালেই আমি আমার ভূমিকা থেকে বাতিল হয়ে গেলাম। পরিচালক মহোদয় আমাকে দু'বার বলেছিলেন, 'মৃত মানুষের অভিনয়ে লাইফ আনতে হবে, অমন কাঠ-কাঠ হয়ে পড়ে থাকলে চলবে না।'

কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি, ফলে আমি বাদ পড়েছিলাম। অন্য এক নায়িকার গল্প জানি। সেই মেয়েটি প্রতি শো বাবদ মাত্র একশ' টাকার বিনিময়ে পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় করত।

বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা সে। একদিন বিয়োগবিহ্বল শেষ দৃশ্যে তার অসামান্য অভিনয় দেখা গেল। ড্রপসিন পড়ে যাওয়ার পর থিয়েটার মালিক

বললেন, 'অসাধারণ! মিসেস চৌধুরী, এরকম অভিনয় কখনও দেখিনি।'

মিসেস চৌধুরী সৎভাবে বললেন, 'শুধু শুধু ধন্যবাদ দেবেন না। পায়ের চপ্পলের একটা কাঁটা উঠে গেছে, সেটা গোড়ালিতে ফুটে যাওয়ায় এত করুণ ভাব এসেছিল। এর মধ্যে আমার কৃতিত্ব কোথায়!'

মালিক বললেন, 'পার শো, প্রতি শো বাবদ দশ টাকা **বেশি দেব, পায়ের** চপ্পলের পেরেকটা তুলে ফেলবেন না, মিসেস চৌধুরী।'

বেঁচে থাকার কারণ

মরা মানুষ বাঁচাবার সত্যিই যে কোন উপায় নেই, এ কথাটা একমাত্র সাপুড়ে ছাড়া বোধহয় সবাই বিশ্বাস করে। কিন্তু বহুদিন কি করে বেঁচে থাকা যায়, কি করে দীর্ঘায়ু, শতায়ু বা তার চেয়েও বেশি দিন জীবিত থাকা যায় এ রকম একটা বাসনা অনেকেরই থাকে।

কি করে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা যায়? এর কি সত্যিই কোন উত্তর আছে?

হয়তো জানা গেল অমুক শতায়ু বৃদ্ধ জীবনে কোনদিন ধূমপান করেননি। সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মনে পড়বে তাঁর কথা যিনি তাঁর সাত বৎসর বয়সে পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণীতে হুঁকোটানা ধরেন আর আজ এই সাতাত্তর বৎসর

বয়সেও নিয়মিত আটখানা বার্মাচুরুট দৈনিক টেনে যাচ্ছেন।

শতায়ু এক চিরকুমারের সন্ধান পাওয়া গেল। বিবাহিতেরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, 'হায়! বিয়ে না করলে আমরাও ঐ রকম দীর্ঘজীবী হতুম।' জনৈক কুলীনকুল প্রদীপ ব্যক্ত করলেন তার প্রপিতামহের কথা যিনি এগারোটি বিয়ে করেও একশ' দশ বৎসর বেঁচে ছিলেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং কিছুই সঠিক বলা যাবে না। আপনিই অনেকদিন বাঁচবেন, বিনা কারণে কিংবা অনেক কারণে, সারা জীবনে একবারও ওষুধ না খেয়ে কিংবা জীবন ধরে ওষুধ ছাড়া আর কিছু না খেয়ে কেন যে বেঁচে থাকবেন, কেন যে মরে যাবেন, কেন, কোন উত্তর কি কোন জ্যোতিষী, কোন চিকিৎসক, কোন দার্শনিক দিতে পারেন। এমনকি যিনি দীর্ঘায়ু তিনিও পারেন না। আর যিনি দীর্ঘায়ু নন, মরে গেছেন বুড়ো হওয়ার আগেই তার কাছে কোন উত্তরই আশা করি না।

সম্প্রতি সত্যিই এক বৃদ্ধ এক অসাধারণ উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি যে এতদিন ধরে বেঁচে আছি তার একমাত্র কারণ আপনাদের ঐ যতসব জীবানু-বীজানু এইগুলো আবিষ্কার হওয়ার অনেক আগেই আমি জন্মেছিলাম।'

বিশ্বাস

বিমান বাহিনীর শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং হচ্ছিল। প্লেন প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ছে, প্যারাসুটে নামার ট্রেনিং হচ্ছে। তরুণ শিক্ষার্থীকে কর্নেল বললেন, 'এইবার আপনি প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন; দেখুন বাঁ হাতের দিকে একটা ফিতে আছে, একটু নামার পরে এই ফিতেটা ধরে টান দিলেই প্যারাসুটটা খুলে যাবে তখন নিশ্চিন্তে ধীরে ধীরে নেমে পড়বেন।'

তারপর তিনি অল্প একটু থেকে এবং একটু কেশে বললেন, 'যদি কোন কারণে দেখেন যে, বাঁ হাতের ফিতেটা টানার পরেও প্যারাসুটটা খুলল না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এই যে ডানদিকেও একটা ফিতে রয়েছে টানলেই

খুলে যাবে। তারপর ধীরে সুস্থে নামবেন। নিচে নামলে দেখবেন বিমান বাহিনীর জিপ রয়েছে, তাতে চড়ে বিমান বন্দরে ফিরে আসবেন। আবার কালকে ট্রেনিং হবে।'

নবীন শিক্ষার্থীটি প্রবল উৎসাহে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর বাঁ হাতের ফিতেটিতে টান দিলেন কিন্তু প্যারাসুট খুলল না। সোঁ সোঁ করে প্যারাসুট নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, তিনি মরিয়া হয়ে ডান হাতের ফিতেটাতে টান দিলেন কিন্তু এবারও প্যারাসুট খুলল না। তীরবেগে মাটির দিকে শিক্ষার্থীটি সমেত প্যারাসুট নামতে লাগল। শিক্ষার্থীটি তখন ভাবছেন, বাটা কর্নেল তো খুব মিথ্যাবাদী। বাঁ হাতের ফিতে টানলাম খুলল না, ডান হাতেও খুলল না, এইবার হয়তো নিচে পড়ে দেখব জিপও নেই। কিছুই বিশ্বাস নেই।

যমরাজা ও ঈশ্বর

শেষরাত্রের দিকে কি একটা কোলাহলে ঈশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি

প্রথমে ভাবলেন তাঁকে বুঝি কেউ স্মরণ করছে। এ-কথাটা ভাবতে তাঁর বেশ ভালই লাগল। কেননা অনেকদিন কেউ আর তাঁকে স্মরণ করেনি। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঈশ্বর বুঝলেন এটা সত্যিই একটা কোলাহল এবং শব্দটা যেন স্বর্গেরই পশ্চিম প্রান্ত থেকে আসছে। তিনি এর কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন অনুভব করলেন।

স্বর্গ এবং নরকের মধ্যে, স্বর্গের ঐ পশ্চিম দিকে যে বৈতরণী নদী ছিল সম্প্রতি কিছুকাল হল সেটা বুজে গেছে। অনেক কাল ধরে বালি জমে-জমে এই অবস্থা। ফলে নরকের অধিবাসীরা প্রায়ই, বৈতরণীর বাধা না থাকায়, স্বর্গে অনধিকার প্রবেশ করতে থাকে। তখন তিনি একদিন যমরাজের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, 'ওহে, একটা বেড়া-টেড়া দিতে হয় যে।' যমরাজা নির্বিকার চিত্তে জানালেন, 'আমার কোন দরকার নেই। তোমার অসুবিধা হয় তুমি দাও।' বাধ্য হয়ে ঈশ্বরকেই স্বর্গের সীমানায় বৈতরণীর তীর ঘেঁসে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হল।

আজ ঈশ্বর দূর থেকেই দেখলেন যে নরকের কিছু দুর্দান্ত বাসিন্দা তাঁর সেই বেড়ার উপরে পা ঝুলিয়ে ব'সে ভয়ঙ্কর দোলাচ্ছে আর হৈ-হট্টগোল করছে। তিনি 'এই-এই' করতে করতে পৌঁছানোর আগেই বেড়াটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল। যমরাজাকে ডাকতে হল ঈশ্বরকে। যমরাজা এলেন।

'তোমার নরকের অধিবাসীরা আমার এই বেড়া ভেঙেছে', ঈশ্বর জানালেন। যমরাজা বললেন, 'জানি'। ঈশ্বর বললেন, 'এ বেড়া এবার তোমাকে সারিয়ে দিতে হবে।' যমরাজা আবার নির্বিকারভাবে বললেন, 'তোমার যদি প্রয়োজন হয়, তুমি লাগিয়ে নাও।' 'আমি লাগাতে যাব কেন?' ঈশ্বরের মুখ গম্ভীর, 'তা'হলে দেখছি এ-বিষয়ে আইনের আশ্রয় নিতে হবে।' যমরাজা এইবার, হো-হো করে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন, 'ঈশ্বর, তোমার এখনো কোন বুদ্ধি হল না। আইন? আইনের আশ্রয়? উকিল পাবে কোথায়? আর হাকিম, মুন্সেফ, পেয়াদা, মুহুরি—সব, সব এই দিকে।' যমরাজা নিজের এলাকায় আঙুল দিয়ে দেখালেন।

বিমূঢ় ঈশ্বর হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, এদিকটা ভাবা হয়নি।

উপকথা

অনেকে হয়ত হটেনটট বলে একটি আফ্রিকান উপজাতির নাম জানেন। এদেরই গ্রাম্য উপকথায় একটি গল্পে বলা হয়েছে মানুষ মরেও অমর হতে পারত কিন্তু কেন মানুষের মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকা হল না।

গল্পটি এইরকম।

চাঁদ একবার একটি মাকড়সাকে মানুষের কাছে এক বার্তা দিয়ে পাঠাল। মাকড়সাকে বলল, 'যাও মানুষদের গিয়ে বলো, যে, চাঁদ যেরকম মরে গিয়েও আবার বেঁচে ওঠে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েও ফের পূর্ণিমায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, ঠিক সেইরকম তোমরা মানুষেরা মরে গেলেও আবার দেখবে বেঁচে উঠবে।'

মাকড়সা এই বার্তা নিয়ে রওনা হল, কিন্তু পথে তার এক খরগোসের সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'কি হে মাকড়সা, এত উত্তেজিত হয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

মাকড়সা বলল, 'আমাকে চাঁদ পাঠিয়েছে মানুষের কাছে! একটা সংবাদ নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

খরগোস প্রশ্ন করল, 'সংবাদটা কি?'

মাকড়সা বলল, 'মানুষদের জানাতে হবে যে মৃত্যুতেই **সব শেষ** নয়, চাঁদের মত মানুষেরাও পারে মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকতে।'

চঞ্চল খরগোস এই শুনে বলল, 'ও এই খবর। তা তুমি থাক, তুমি যা ধীরে ধীরে চলছ, তার চেয়ে আমি ছুটে গিয়ে মানুষকে এই সংবাদ দিয়ে আসি।'

খরগোস ছুটে গিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি মানুষকে সংবাদ পৌঁছে দিল বটে কিন্তু অস্থিরমতি বলে চাঁদের পাঠানো খবরটাই সে ঘুলিয়ে ফেলল। সে মানুষকে গিয়ে বলল, 'চাঁদ জানিয়েছে যে মৃত্যুই শেষ তারপর আর তোমাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।'

খরগোস ফিরে এসে চাঁদকে বলল, 'আমি আপনার পাঠানো সংবাদ মানুষদের দিয়ে এসেছি। তাদের বলেছি যে মৃত্যুই সব শেষ, মৃত্যুর পরে তোমাদের আর কিছু থাকবে না।'

চাঁদ শুনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেল। এই বোকা খরগোসটা তার পাঠানো বার্তাকে একেবারে উল্টো করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। রেগে গিয়ে চাঁদ একটা কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে খরগোসকে নাকে মারল। সেই থেকে খরগোসের নাকের এই অবস্থা।

আর মানুষ? মানুষ তো খরগোসের কথাই বিশ্বাস করে বসে আছে। সে

আজো জানে মৃত্যুই শেষ। আর তাই বুঝি চাঁদ প্রত্যেক অমাবস্যার শেষে আবার পূর্ণিমায় বেঁচে উঠে এই অনন্তকাল ধরে মানুষকে বোঝাতে চাইছে, তোমরাও আমারই মতো অমর। খরগোস যা বলেছিল তা সত্য নয়।

ধর্ম

ধর্ম কি? এই বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। প্রাচীন গল্প এটি। এই গল্পটির উল্লেখ করেছেন দালাই লামা তিব্বত নিয়ে লেখা তাঁর বই 'My land and my people' -র শেষ অংশে। এই গল্পটি দিয়েই দালাই লামা ধর্ম কি তাই বোঝাতে গিয়ে ঐ গ্রন্থটির উপসংহার টেনেছেন।

গল্পটি এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

একদিন এক লামা (মানে তিব্বতীদের ধর্মীয় গুরু) দেখলেন যে এক ব্যক্তি একটি বৌদ্ধস্তূপের চারপাশে ক্রমাগত পরিক্রমা করে চলেছে। বৌদ্ধস্তূপের চারদিক ঘুরে ঘুরে আসা তিব্বতী বৌদ্ধদের অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় আচরণ।

এই লোকটিকে বৌদ্ধস্তূপের চারপাশে ঘুরতে দেখে লামা বললেন, 'তুমি যে এই স্তূপ পরিক্রমা করছ এ অবশ্যই পবিত্র কাজ। কিন্তু এর চেয়ে ভাল

হয় তুমি যদি ধর্মীয় আচরণ করতে পারো।'

লোকটি অবাক হয়ে ভাবল, 'কিন্তু এওতো ধর্মীয় আচরণ, তা হলে?' কিছুক্ষণ থেমে থেকে লোকটা লামাকে বলল, 'ঠিক আছে এবার থেকে আমি শুধু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করব।'

কিছুদিন ধরে লামা দেখলেন লোকটি ক্রমাগত একনিষ্ঠ সাধনায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে যাচ্ছে, তারপর একদিন তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি এ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছ এ অবশ্যই পবিত্র কাজ। কিন্তু এর চেয়ে ভাল হয় তুমি যদি ধর্ম আচরণ করতে পার!'

লোকটি এবারো অবাক হল। তাহলে আর কি করা যায়? সে লামাকে বলল, 'তা হলে এবার থেকে আমি ঈশ্বরের তপস্যা করব।'

লোকটি ঈশ্বরের আরাধনায় বসল। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলল সেই তপস্যা। তারপর আবার একদিন লামা তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি যে এই তপস্যা করছ, এ অবশ্যই পবিত্র কাজ। কিন্তু এর চেয়ে ভাল হয় তুমি যদি 'ধর্ম' আচরণ করতে পার।'

লোকটি এইবার বিমূঢ়, বিভ্রান্ত বোধ করল। সে লামাকে অনুরোধ করে জিজ্ঞাসা জানাল, 'আমি স্তূপপরিক্রমা করলাম, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলাম, তপস্যা করলাম তবুও আমার 'ধর্ম' আচরণ হল না?'

লামা লোকটির মাথায় হাত রেখে মৃদু হেসে বললেন, 'এ সবই পবিত্র কাজ। ধর্ম এরই মধ্যে রয়েছে কিন্তু তবুও এর ঊর্ধ্বে, সমস্ত বাহ্যিক ও ঐহিক আচরণের উপরে যে 'ধর্ম' তুমি তারই আচরণ কর।'

রেলগাড়ি

একটা বিলিতি গল্প আছে। কোন এক স্টেশনে কুলির সঙ্গে ঝগড়া, যাত্রী রেগে গিয়ে তাকে টেনে এক চড় মারলেন। কিন্তু গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে আর এতই দ্রুত ধাবমান যে সেই উদ্যত চড় লাগল পরের স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের গণ্ডদেশে যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে প্ল্যাটফর্মে পায়চারী

করছিলেন। এই রকম প্রায় একই রকম আরো অসংখ্য গল্প। কিন্তু সবাইকে হার মানিয়েছে সেই গল্পটি।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক, ছোট স্টেশন, এক্সপ্রেস গাড়ি দাঁড়ায় না। একটা এক্সপ্রেস যাওয়ার সময় হয়েছে। ভদ্রলোক হঠাৎ দেখলেন লাইনের উপর দিয়ে ধোঁয়ার মতো কি যেন দেখতে না দেখতে দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?' স্টেশন মাস্টার স্মিত হাস্যে জানালেন, 'ও কিছু না, এক্সপ্রেসটা গেল।' ভদ্রলোকটি স্টেশন মাস্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখেন ভৌতিক কাণ্ড। একটা গাড়ির ছায়া লাইন ধরে দ্রুতবেগে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, কিন্তু কোন গাড়িটাড়ি নেই। ভদ্রলোক বিচলিত হয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকতেই কোন প্রশ্ন করার আগেই আবার স্টেশন মাস্টার স্মিতহাস্যে বললেন, 'এক্সপ্রেসটার ছায়া, ও কিছু না, আব্দুল ড্রাইভার যেদিন লেট হয়ে যায় এমন ক্ষেপে চালাতে থাকে ব্যাটা মাতাল, গাড়িটাতো দেখা যায়ই না, গাড়ির ছায়াটা পর্যন্ত পিছিয়ে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতে পারে না।'

চোর, ডাকাত ইত্যাদি

বিলেত থেকে এক সাহেব এসেছিলেন তাঁর ব্যবসার কাজে। এই উপমহাদেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। তাঁর কাজ হল বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংগ্রহ করা।

জহরলালের টুপি, রবীন্দ্রনাথের জোব্বা, কায়েদে আজম জিন্নার সেফটি রেজার এই সব সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

মহাপুরুষদের উত্তরাধিকারীরা এই সব সযত্নে রক্ষা করেন, তবে অনেক সময় চুরি হয়ে যায়। সেগুলো বহুমূল্যে বিক্রি হয়। কখনো কখনো দুঃস্থ উত্তরাধিকারীও অর্থের প্রয়োজনে বেচতে বাধ্য হন।

বিলেত, লণ্ডন-নিউইয়র্কে এই সব জিনিস নিলামঘরে চড়া দরে বিক্রি হয়। এর মধ্যে নার্গিস বা মধুবালার ব্যবহৃত শাড়ি কিংবা ক্রিকেটার মুস্তাক আলি বা মানকড়ের ব্যাট বা সাদা শার্ট থাকাও বিচিত্র নয়।

এই ব্যবসায়ীকে একবার পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। কারণ পুলিশের কাছে খবর এলো যে মহাত্মা গান্ধীর খসে পড়া কয়েকটা পুরনো দাঁত এক ব্যক্তি আমেদাবাদ আশ্রম থেকে চুরি করে বিক্রি করছে, যার মধ্যে দুটো দাঁত এই সাহেবও কিনেছে।

সাহেবকে ধরার পর সেই সূত্রে আমেদাবাদ শহরের একটি বাড়ি থেকে সেই দাঁত চোরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বাড়ি সার্চ করে একটি খদ্দরের ঝোলা পাওয়া যায়, ঝোলার গায়ে গুজরাটি ভাষায় লেখা,

'মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র দাঁত।'

এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সেই ঝোলায় ছিল একশো চল্লিশটি দাঁত।

বলা বাহুল্য, এতগুলি দাঁত মহাত্মা গান্ধীর হতে পারে না। কোন একজন মানুষের হতে পারে না। একে বলা চলে, ঠকানোর কারবার।

এই রকম আরেকটি পুরনো গল্প আছে। সেটাও এই রকম এক সংগ্রহকারীকে ঠকানোর গল্প।

সেই সংগ্রহকারী মুর্শিদাবাদে এক ব্যক্তির খোঁজ পেয়ে তার কাছে

গিয়েছিলেন নবাব আলিবর্দির মাথার করোটি কিনতে। মাথা দেখে তো আর বোঝা যাবে না সেটি কার মুণ্ডু, বিশ্বাস করে কিনতে হবে। সেই সংগ্রাহক বিশ্বাস করেই নর মুণ্ডটি সংগ্রহ করলেন।

তখন বিক্রেতার সাহস বেড়ে গেল। সে বলল যে তার কাছে সিরাজদৌল্লার মাথাও আছে। ক্রেতা সানন্দে সিরাজদৌল্লার করোটি কিনতে রাজি হলেন।

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, বিক্রেতা সেই মুহূর্তে ধারেকাছে কোথাও থেকে একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাথার খুলি জোগাড় করতে পারলো না। তবে একটা ছোট খুলি জোগাড় হল, কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের খুলি হবে সেটা।

ছোট খুলি দেখে সংগ্রাহকের মনে কেমন যেন সন্দেহ দেখা দিল। তিনি বাধ্য হয়েই বললেন, 'নবাব সিরাজদৌল্লা ছিলেন পূর্ণবয়স্ক যুবক, তার করোটি এত ছোট হবে কি করে?'

বিক্রেতা ব্যক্তিটি ঘুঘু জোচ্চোর। প্রথমে একটু থতমত খেয়ে তারপরে সে বলল, 'এটা সিরাজদৌল্লার অল্প বয়েসের মাথার খুলি।'

চোর-ডাকাত নিয়ে লিখবো ভেবেছিলাম। কিন্তু দুটো গল্পই হয়ে গেল জোচ্চোর নিয়ে। সে যা হোক, জোচ্চোরও চোর। চোর-ডাকাতের ব্যাপার এবার থাক, বরং একটা অন্য গল্প বলি।

ঠিক গল্প নয়। একটি দাম্পত্য কথোপকথন ঃ—

স্ত্রী (উত্তেজিত কণ্ঠে) ঃ জোচ্চোর। বিয়ের আগে আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। আসলে আমি একটা গাধা।

স্বামী (ঠাণ্ডা গলায়) ঃ তুমি যে একটা গাধা, বিয়ের আগে আমি প্রেমে এত মশগুল ছিলাম যে আমি সেটা খেয়াল করতে পারিনি।

চোর ও উকিল

এই লঘুনিবন্ধের এ রকম নামকরণ দেখে কেউ যেন ভাবতে বসবেন না যে মাননীয় উকিল সাহেবদের কোনরকম হেয় করার ইচ্ছে আমার আছে।

আমি নিজে উকিল নই। কিন্তু আমি চারপুরুষের উকিলবাড়ির ছেলে। আমার পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ, জ্যেষ্ঠ পিতামহ এঁরা পুরুষানুক্রমে আটিয়া পরগণার আসল থেকে টাঙ্গাইল মহকুমা তথা জেলা পর্যন্ত ধলেশ্বরী অববাহিকায় শতাধিক বৎসর তাঁরা ওকালতি করেছেন। এখনো কদাচিৎ যদি দেশে যাই, পুরনো মক্কেলেরা কেউ কেউ আসেন, বলেন, 'ছোট কর্তা থাকো। যাইয়ো না। আমাগোর জমিজিরাত এখন তোমারেই দেখতে হবো।'

চোর এবং উকিলের প্রথম গল্পটি অতিবিখ্যাত। সকলেই কখনো না কখনো শুনেছেন। এমনকি আমার একটা বইতেও এই কাহিনীটি আমি লিখেছিলাম।

কিন্তু এই রম্যনিবন্ধে এই কাহিনীটি যুক্ত না করলে নিবন্ধটির প্রতি অবিচার করা হবে।

সুতরাং।

উকিলের কাছে মক্কেল এসেছে। নতুন মক্কেল। একে আগে উকিলবাবু দেখেননি।

উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সমস্যা কি বলুন।'

মক্কেল বললেন, 'আজ্ঞে একটা কেসে জড়িয়ে পড়েছি।'

উকিল ঃ 'কিসের কেস?'

মক্কেল ঃ 'আজ্ঞে একটা চুরির কেস।'
উকিল ঃ 'কি চুরি?'
মক্কেল ঃ 'আজ্ঞে এক কেস হুইস্কি।'
উকিল ঃ 'হুইস্কির কেসটা নিয়ে আসুন।'

সব উকিলসাহেবই অবশ্য এরকম নন। সামাদ উকিলের কথা বলতে পারি। তিনি ধর্মভীরু। সৎ লোক। পাঁচ বেলা নামাজ পড়েন। খুব সাধু মানুষ। কখনোই কোন মিথ্যা মামলা গ্রহণ করেন না।

সামাদ সাহেবের কাছে মক্কেল এসেছে। সামাদ সাহেব তাকে যথারীতি বললেন, 'দেখুন আমার ফি পাঁচশো টাকা। কিন্তু তা দিলেও আপনার কেস আমি করবো না যদি সেটা মিথ্যে কেস হয়।'

তারপর একটু বিরতি দিয়ে বললেন, 'তা আপনার মামলা কি, বলুন।'

মক্কেল বলল, 'স্যার পুলিশ আমাকে একটা গয়নার দোকানের চুরির মামলায় ফাঁসিয়েছে। একেবারে মিথ্যে মামলা স্যার, আমি সত্যিই নির্দোষ। তবে..'

মক্কেল কিঞ্চিত ইতস্তত করছে দেখে সামাদ সাহেব বললেন, 'তবে কি?'

মক্কেল বলল, 'স্যার আপনার ঐ ফি পাঁচশো টাকা, পুরোটা নগদে দিতে

পারবো না। দুশো টাকা নগদে দেবো। আর তিনশো টাকা...।' এই পর্যন্ত বলে মক্কেল থেমে গেল।

সামাদ সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'আর তিনশো টাকা?'

মক্কেল বলল, 'তার বদলে আপনাকে একটা সোনার আংটি দেবো স্যার। ভাল জুয়েলারি দোকানের খাঁটি সোনার জিনিস। একেবারে নতুন স্যার।'

এর পরে সামাদসাহেব কি করেছিলেন তা অবশ্য আমরা জানি না। তবে এই জাতীয় অন্য একটা গল্প জানি।

এক চুরির মামলায় আঠারো জন সাক্ষী। সকাল থেকে জেরা চলছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসামীর পা ধরে গেছে। বিকেলের দিকে সে তার উকিলকে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কতক্ষণ?'

উকিলসাহেব বললেন, 'আমার মিনিট পনেরো আর তোমার বোধহয় দু বছর।'

পুনশ্চ :

মামলায় খালাস হওয়া কৃতজ্ঞ চোর আদালতের বারান্দায় উকিলসাহেবকে বলল, 'একদিন আপনার বাসায় যাবো স্যার।'

একটু চিন্তা করে উকিলবাবু বললেন, 'তা এসো। কিন্তু দিনের বেলায় এসো।'

pathagar.net

বই

একটা বই লেখার চেয়ে বই নিয়ে কিছু লেখা ঢের কঠিন।

বই সংক্রান্ত বিলিতি জোকবুকের একটা অনবদ্য রসিকতা চমৎকার করে বাংলায় পরিবেশন করেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর 'পঞ্চতন্ত্রে'।

আমিও সেই গল্পটি আমার মতো করে দুয়েকবার বলেছি। আবারও বলি, না হলে বই নিয়ে কোন সরস নিবন্ধ জমতে পারে না।

গল্পটা এই রকম।

এক ভদ্রমহিলা একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে তাঁর স্বামীর জন্মদিনের জন্য উপহার কিনতে গেছেন। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হল সেই রকম বড় দোকান যে দোকানে জিরে থেকে হিরে সব কিছু পাওয়া যায়।

ভদ্রমহিলা সুন্দরী ও সুসজ্জিতা। তিনি দোকানের একতলা, দোতলা, তিনতলায় বিভিন্ন শাখায় ঘুরে ঘুরে অনেক রকম জিনিস দেখলেন কিন্তু কিছুই তাঁর পছন্দ হচ্ছে না দেখে দোকানের ম্যানেজারসাহেব স্বয়ং এগিয়ে এলেন, হাসিমুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন মুখে নিয়ে বললেন, 'ম্যাডাম?'

ভদ্রমহিলা সলজ্জ হেসে বললেন, 'আমার বরের জন্মদিনের জন্যে একটা প্রেজেন্ট কিনতে এসেছি। কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না।'

ম্যানেজারসাহেব অবাক, 'সে কি আমাদের এত বড় দোকান। কত রকম জিনিস। এর মধ্যে পছন্দসই কিছু পেলেন না। আর কিছু না হোক বাটিকের কাজ করা এই ঝলমলে নেকটাইটা কিনতে পারেন। একেবারে নতুন ডিজাইন।'

মহিলা জানালেন, ও রকম একটা টাই তাঁর স্বামী দুয়েকদিন আগেই কিনেছেন। এই ভাবে সিগারেট কেস, সুদৃশ্য লাইটার, সিল্কের পাঞ্জাবি, পুরুষালি পারফিউম অনেক কিছুই দেখালেন ম্যানেজারসাহেব, কিন্তু সবই সেই মহিলার স্বামীর একটা করে আছে।

অবশেষে বুক ডিপার্টমেন্ট, সেখানে প্রবেশ করে অগত্যা ম্যানেজারসাহেব প্রস্তাব করলেন, 'তাহলে মিস্টারের জন্যে একটা বই নিয়ে যান। মহিলা অম্লানবদনে বললেন, 'বইও একটা আছে আমার বরের।'

এই পর্যন্ত এসে মুজতবা গল্পটা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এর পরে আরও একটু আছে।

কিছুদিন পরে ঐ মহিলা ঐ দোকানে আরেকবার এসেছেন। ম্যানেজারসাহেব তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। পূর্ব অভিজ্ঞতাবশত তাঁর কৌতূহল হল, দেখি এবার ইনি কি কেনেন?

এগিয়ে গিয়ে মহিলার কাছে দাঁড়াতে মহিলা হেসে বললেন, 'আমি একটা বই কিনতে এসেছি।'

ম্যানেজারসাহেব অবাক, 'সে কি আপনাদের তো একটা বই আছে।'

মহিলা বললেন, 'সে বইটা তো আমার বরের। এদিকে আমার জন্মদিনে একটা টেবিল ল্যাম্প উপহার পেয়েছি। তাই নিজের জন্যে একটা বই কিনতে

এসেছি।'

এর পরেও বলি, সত্যিই প্রত্যেক গৃহে অন্তত একটা বই থাকা উচিত। যারা লেখাপড়া জানে না তারা ছবি দেখে মজা পাবে। যারা লেখাপড়া জানে তারা পড়ে মজা পাবে। কাজের মেয়ের আরশোলা মারার সুবিধে হবে। খাটের পায়া নড়বড়ে হলে সেখানে ঠেকা দেওয়া যাবে। বেড়াল বিরক্ত করলে ছুঁড়ে মারা যাবে।

একটা বই অবশ্য আজকালকার সব গৃহেই থাকে, সেটা টেলিফোন ডিরেক্টরি।

একদা এক খ্যাতিবিলাসী ভদ্রলোককে কে যেন বলেছিল, 'একটা প্রামাণ্য বিশালকায় গ্রন্থে সেদিন আপনার নাম দেখলাম।'

ভদ্রলোক একটু স্ফীত হয়ে বললেন, 'সে কি? আমিও বইটি দেখিনি। কি বই বলো তো?'

সংবাদদাতা গম্ভীর হয়ে জানালেন, 'নতুন টেলিফোন ডিরেক্টরি।'

পুনশ্চ :

একটি প্রক্ষিপ্ত গল্প।

সম্প্রতি কলকাতার একটি দৈনিক পত্রে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মহম্মদ এরশাদের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারের সঙ্গে পরিপূরক হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে কবি-রাজনীতিকের একটি কবিতা।

দুঃখের বিষয় সেই কবিতার অনেকাংশই আমার লেখা একটি কবিতার অন্ধ অনুসরণ। 'দিন আনি দিন খাই' বইয়ের 'আমাদের সন্ধ্যাতারা' কবিতায় আমি লিখেছিলাম, (প্রথম চার পংক্তি)

'অনেকদিন আমাদের প্রিয় কবি
তেমন কোন কবিতা লেখেন নি।
অনেকদিন আমাদের প্রিয় লেখকের
কোন গল্প পড়ে চোখের জল ফেলিনি।'

মাননীয় এরশাদ সাহেব লিখেছেন,

'অনেকদিন আমার প্রিয় কবি
কোন কবিতা লেখেনি।

অনেকদিন কোন লেখা পড়ে
চোখের জল ফেলিনি...'

এই হাস্যকর নিবন্ধে এই ঘটনার কোন স্থান থাকতে পারে না। কিন্তু আমার সমস্যা আলাদা।

বিষবৃক্ষ, অভাগীর স্বর্গ, পথের পাঁচালী, নতুন যুগের সমরেশ, সুনীল, শীর্ষেন্দু—তার পরেও দিন চলে গেছে, এর মধ্যে আর কোন বই পড়ে চোখের জল ফেলিনি।

কিন্তু চোখের জল এল কাল রাতে অন্য রকমের একটা বই পড়ে। আপনি অবশ্যই জানতে চাইতে পারেন এমন অসামান্য বইটা কি? নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু বলছি, সেটা আমার ব্যাঙ্কের পাশ বই।

মারাত্মক

মারাত্মক শব্দটি আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করি।

অভিধান অনুসারে কথাটির অর্থ হল, সংহারক, প্রাণনাশক। মার-আত্মা-যাহার অর্থাৎ যার মারণ স্বভাব। বহুব্রীহি সমাস।

শুধু মারাত্মক নয়, মারাত্মিকাও পুরনো অভিধানে পাওয়া যাবে, লিঙ্গান্তর করে স্ত্রী লিঙ্গে।

সে যা হোক। বহু ব্যবহারে মারাত্মক শব্দটির ঝাঁঝ কমে গেছে। আজকাল কথায় কথায় লোকে বলে, মারাত্মক ঝাল, মারাত্মক দাম কিংবা মারাত্মক বই। অবশ্য মারাত্মক ছেলে কিংবা মারাত্মক মেয়ের কথাও হামেশাই শোনা যায়।

এ সব থাক। আমি একটি মারাত্মক বইয়ের কথা বলি।

সম্প্রতি আমি মাস দুয়েক বিদেশের এক বিখ্যাত বিদ্যানগরীতে ছিলাম। ইউনিভার্সিটি শহর। বার্কলে, আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে মহানগরী সানফ্রানসিসকোর শহরতলি। বেশ ছোট শহর।

এই ছোট শহরে বার্নস এ্যাণ্ড নোবল, পেগাসাস থেকে আরম্ভ করে বিশাল আয়তনের বইয়ের দোকানের ছড়াছড়ি। সেই সঙ্গে রয়েছে বার্কলে পাবলিক লাইব্রেরি এবং বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত গ্রন্থাগার।

সারাজীবনের বই দেখার আনন্দ সম্পূর্ণ করেছি এই দুমাসে। লাইব্রেরির বই নিজের হাত দিয়ে ঘেঁটে দ্যাখো। দোকানের বই পাশে রাখা চেয়ারে বসে যতক্ষণ ইচ্ছা পড়ো। এত আনন্দ জীবনে খুব বেশি বই না কিনে পাঠ করার সৌভাগ্য হয় নি।

অবশ্য এই রম্য নিবন্ধ বই নিয়ে নয়। নিবন্ধটি একটি মারাত্মক বই নিয়ে। বইটি এই বার্কলে শহরেই এক বইয়ের দোকানে বড়দিনের সেলে পেয়েছিলাম দশ ডলারের বই আট ডলারে। সেও কম নয় প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা।

বইটির নাম বলা যাবে না। তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমার লেখার

জারিজুরি অনেক ধরা পড়ে যাবে। নাম না জানিয়ে সংক্ষেপ করে বলে রাখি, এটি একটি অভিধান জাতীয় বই। বিভিন্ন শব্দের মারাত্মক সব সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই বইতে।

অধিকাংশ সংজ্ঞাই অত্যন্ত চমকপ্রদ। সেগুলি আমি যথা সময়ে ব্যবহারের জন্য হাতে রাখছি। আপাতত দু-চারটি পাঠকের কৌতূহল নিরসনের জন্যে উপস্থাপন করছি।

বি.এ (B.A) দিয়ে শুরু করি। বি.এ. মানে সেই পুরনো বি.এ. ডিগ্রি। উপাধি হিসেবে যা নামের পরে ব্যবহৃত হয়।

বলা উচিত, ব্যবহৃত হত। আজকাল আর কেউ নামের পাশে বি.এ. লেখে না। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, জলভাত হয়ে গেছে।

সে যা হোক, এই অমূল্য গ্রন্থে বি.এ. ডিগ্রি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই ডিগ্রি কারো থাকলে বোঝা যায় যে ওর প্রাপক ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম দুটি বর্ণ আয়ত্ত করেছে, কিন্তু ভুল শিখেছে, উল্টো শিখেছে। AB শিখতে গিয়ে BA শিখেছে।

চমৎকার!

এর চেয়েও চমৎকার Dogma শব্দটির ব্যাখ্যা। এমনিতে সবাই জানেন, এই ডগমা শব্দটির ব্যবহার হয় অন্ধ নীতি ও সংস্কারের অর্থে। দেবসাহিত্য

কুটির থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত এ.টি.দেব তথা আশুতোষ দেবের ইংরেজি-বাংলা অভিধানে ডগমা অর্থ দেওয়া আছে মতবাদ, এবং তারপরে গোঁড়া মতবাদ। সে যা হোক, ডগমা প্রসঙ্গে প্রবাসে আমাদের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

আমার ছেলের নাম কৃত্তিবাস। মার্কিন দেশে সেটা কৃত্তি হয়েছে। কৃত্তিবাস যে বাড়িতে ভাড়া থাকে সে বাড়ির ল্যান্ডলেডি এক কোরিয়ান মহিলা কৃত্তিবাসকে কৃত্তি বলে ডাকেন। সেই সূত্রে আমরা ওখানে যাওয়ার পরে ওই মহিলা কৃত্তিবাসের মাকে কৃত্তিমা বলে সম্বোধন করতেন।

আমাদের মারাত্মক বইটিতে ডগমা শব্দের অর্থও দেখলাম লেখা আছে কুকুরের মা, ডগ মানে কুকুর এবং মা হল মা।

এই বইতেই উকিল শব্দের অর্থ দেওয়া আছে, এক ধরনের বেড়াল যে ইঁদুরদের ঝগড়ার মীমাংসা করে।

সবচেয়ে মারাত্মক হল সংখ্যাতত্ত্ববিদের সংজ্ঞা। এই বইতে বলা আছে যে যদি আপনার শরীরের কোমর থেকে উর্ধ্বাংশ জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করানো হয় এবং শরীরের নিম্নাংশ বরফশীতল জলে নিমজ্জিত করা হয়, তাহলে আপনার অবস্থা যাই হোক না কেন, সংখ্যাতত্ত্ববিদ খুব হিসেব করে বলবেন যে গড়পড়তা আপনি মোটামুটি বেশ ভালই আছেন।

সত্যিই চমৎকার। মারাত্মক চমৎকার!!

পুনশ্চ :

এই মারাত্মক গ্রন্থের বহু মারাত্মক সংজ্ঞা এবং বিশ্লেষণ হাতে ধরা রইল। কিন্তু কেমন যেন মনে হচ্ছে একটু ফাঁকি দেওয়া হয়ে যাচ্ছে।

নিতান্ত পাপবোধ থেকে আরো একটি শব্দের সংজ্ঞায় যাচ্ছি। শব্দটি হল এটিকেট।

এই বইতে লেখা আছে, এটিকেট হল সেই বস্তু যা তোমাকে শেখায় কি করে মুখ না খুলে হাই তুলতে হয়।

দূরদর্শন

এই রম্য নিবন্ধের প্রধান ভরসা একটি পৌরাণিক কাহিনী।

চটুলা পাঠিকা যদি চোখের চশমা কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করেন, 'পৌরাণিক কাহিনীতে দূরদর্শন, টি.ভি? তারাপদবাবু উলটো-পালটা লিখে লিখে অবশেষে আপনি পাগল হয়ে গেলেন?'—

এর উত্তরে আমি বলব, 'ভাই একটু অপেক্ষা কর, অনতিবিলম্বে আমি পৌরাণিক দূরদর্শনের কথা বলছি।

পৌরাণিক যুগ আপাতত একটু দূরে। আমরা মধ্যযুগ থেকে একটু ঘুরে আসি। মধ্যযুগ মানে আমাদের যৌবন বিকাশ। জহরলাল নেহেরুর ভারতবর্ষ।

আট-আনা সের চাল। তিন টাকা সের মাংস। এক খিলি মিঠে পান দু পয়সা। আনন্দবাজারে অল্পবিস্তরে শিবরাম চক্রবর্তী।

সেই 'অল্পবিস্তরে' দূরদর্শন তথা টি.ভি নিয়ে আমাদের সেনাপতি শিবরাম চক্রবর্তী একবার মহাকবি শেক্সপিয়র সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে লড়েছিলেন।

তখন সংসদে, রাজ্যসভায়, লোকসভায়, সংসদের বাইরে খবরের কাগজে, বুদ্ধিজীবী মহলে দেশের সর্বত্র, ভারতের মতো গরিব দেশে টি.ভির প্রয়োজন আছে কিনা এই নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলছে।

সেই সময়কার একটি অবিস্মরণীয় কার্টুনের কথা মনে পড়ছে। বোধহয় প্রমথ সমাদ্দারের আঁকা সেই কার্টুন, এ যুগে প্রমথবাবুর মতো কার্টুনিস্ট আর দেখা যায় না।

তখন দুটো প্রশ্ন ভারতের সামনে ছিল।

(এক) ভারত আণবিক বোমা বানাবে কিনা?

(দুই) ভারতে টি.ভি চালু করা হবে কিনা?

প্রমথ সমাদ্দার তাঁর কার্টুনে দেখিয়েছিলেন, রাস্তায় বসে দুজন ভিখিরি পরস্পর জোর বাদানুবাদ করছে, আগে টি.ভি না আণবিক বোমা, নাকি

দুটোই, নাকি কোনওটাই নয়।

একটি গরিব দেশের দুই ভিখিরির এই মর্মস্পর্শী বিসংবাদ, চিরকালের শ্রেষ্ঠ কার্টুনগুলির একটি।

'অল্পবিস্তরে' শিবরাম চক্রবর্তী ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন শুধু দূরদর্শন নিয়ে। শেক্সপিয়রের এক বিখ্যাত চরিত্রের অনুকরণে শিবরাম লিখেছিলেন।

'টি ভি অর নট টিভি, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন।'

(শেক্সপিয়র লিখেছিলেন, To be or not to be that is the Question? শিবরাম চক্রবর্তী তাকে করলেন, TV or not TV That is the Question.)

অতঃপর দূরদর্শনের পুরাকালে যেতে পারি। পুরাকালের গল্পটি অগস্ত্য মুনিকে নিয়ে।

তার আগে প্রাচীন যুগের বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ব্যাপারে একটা প্রচলিত রদ্দি গল্প বলে নিই।

একটি কলেজের ছেলে গোপাল, পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়িতে গিয়েছিল। ছুটির পরে দেশ থেকে ফিরে এসে সে শুধুই নিজের গ্রামের নানা রকম বিশ্বাস্য—অবিশ্বাস্য কথা বলে, অযথা দম্ভ করে বন্ধু বান্ধবদের জীবন অতিষ্ঠ করে চলেছে।

একদিন গোপাল সমস্ত সীমা অতিক্রম করল। সবাইকে বলল যে, 'জানিস, শুধু এখনকার কথা নয়। অনেকদিন আগে থেকে আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ, তার এসব ছিল।'

বন্ধুরা তাজ্জব, 'কত আগে থেকে?'

গোপাল গম্ভীর হয়ে বলল, 'অন্তত দু'শ—তিনশ বছর হবে।'

বন্ধুরা এতটা গ্রহণ করতে রাজি নয়, তারা প্রতিবাদ করল, 'অসম্ভব। তিনশ বছর আগে ইলেকট্রিসিটি, টেলিগ্রাফ কিছুই ছিল না। তোদের গাঁয়ে ছিল এ কথা কে বলেছে?'

অতঃপর খুবই মুরুব্বি ভঙ্গিতে গোপাল জানাল যে সেচ দপ্তর তাদের গ্রামে খাল কাটছে। সেই খালের মাটি খুঁড়তে গিয়ে মাটির নীচ থেকে অনেক তার বেরিয়েছে, সেগুলো হয় ইলেকট্রিকের নয় টেলিগ্রাফের তার, না হলে আর কী হতে পারে?

এ জাতীয় লজিক মানতে রাজি নয় গোপালের বন্ধুরা। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'এ আর বেশি কথা কী? আমাদের গ্রামেই তো ওয়ার-লেস

ছিল।'

গোপাল বলল, 'সে আবার কী?'

সে বলল, 'আমাদের গ্রামে কত কুয়ো খোঁড়া হয়েছে, পুকুর কাটা হয়েছে—কোনওদিন কোনও তার বেরোয়নি।'

গোপাল বলল, 'এর মানে কী?'

সে বলল, 'ওয়ার লেস ছিল।'

অগস্ত্য মুনির গল্পটা এবার বলার সময় হয়েছে।

আমরা ছোটবেলায় ইল্বল ও বাতাবি নামে দুই রাক্ষস, সমুদ্রের জল শোষণ ইত্যাদি গল্পের সঙ্গে অগস্ত্য মুনির কাহিনী পড়েছি।

ভাদ্রমাসে লোকে বাড়ি ছেড়ে, ঘর ছেড়ে যাবে না। যাত্রা নিষিদ্ধ। এরই মধ্যে পহেলা ভাদ্র সবচেয়ে মারাত্মক। এ দিনের যাত্রা হল অগস্ত্য যাত্রা।

কেন অগস্ত্য যাত্রা, এবার সেটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিন্ধ্য পর্বত। সেই বিন্ধ্য পর্বত ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে যাচ্ছিল। একদিন সূর্যদেব দেখলেন শিগগিরই বিন্ধ্য পর্বত বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাঁর অন্তরীক্ষ পরিক্রমায়। দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতে তিনি ঠেকে যাবেন। বিন্ধ্য পর্বত টপকিয়ে তাঁর যাতায়াত অসম্ভব হবে।

সূর্যদেব ভগবানকে এ কথা জানাতে তিনি বিন্ধ্য পর্বতের গুরুদেব অগস্ত্যমুনিকে ঘটনাটা বলে এর প্রতিকার করতে বললেন।

অনেক রকম ভেবে চিন্তে অবশেষে অগস্ত্যমুনি একটা বুদ্ধি বার করলেন।

সে দিনটা ছিল পয়লা ভাদ্র, তিনি আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্য রওনা হলেন। পথে বিন্ধ্য পর্বত। বিন্ধ্য অগস্ত্য গুরুদেব ঋষিকে দেখে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এইভাবে থাক।'

অগস্ত্য সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। বিন্ধ্য তদবধি নতজানু হয়ে আছে। সূর্য বিনা বাধায় দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছে।

এ কাহিনীতে দূরদর্শন নেই। দূরদর্শন আছে একটি দক্ষিণী কাহিনীতে। হর-পার্বতীর বিয়ে। নিমন্ত্রণ পেয়ে সব মুনি-ঋষি হিমালয়ে গেছে সেই বিয়ে দেখতে। দাক্ষিণাত্য ঋষি শূণ্য। ভগবান অগস্ত্যমুনিকে দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন। মুনির আফসোস, 'আমি হর-পার্বতীর বিয়ে দেখতে পাব না।' ভগবান বললেন, 'পাবে তুমি দাক্ষিণাত্যে বসেই সে দৃশ্য দেখতে পাবে।'

এবং সেই থেকে দূরদর্শনের সূচনা।

পুনশ্চ :

বাংলায় বোকা বাক্স কথাটা আজ কিছুদিন হল চালু হয়েছে, টিভি বোঝাতে ইংরেজিতে যেমন ইডিয়ট বক্স কথাটি ব্যবহৃত হয়।

দূরদর্শন সকলেই দেখে অথচ দূরদর্শনের ওপরে সকলেরই রাগ। নানা রকম গাল মন্দ করে, অনেকে প্রোগ্রাম দেখতে দেখতে মাথা গরম হয়ে উঠে গিয়ে নিজের টিভি নিজেই ভেঙে ফেলে।

সত্যি মিথ্যে জানি না, শুনেছি বিদেশে, যেমন ওয়াটার প্রুফ, শকপ্রুফ ঘড়ি হয় তেমনিই কিক প্রুফ (Kick Proof) টিভি বেরিয়েছে। রেগে গিয়ে যতই লাথি মারো টিভি'র কিছু হবে না।

টিভির সম্পর্কে তাহলে কি ভাল কথা কিছুই বলার নেই?

অনেক ভেবে চিন্তে একটা গল্প মনে পড়ছে সেটা অবশ্য আমাদের অতি পুরনো প্রিয়পাত্র গঙ্গারামের কাহিনী।

গঙ্গারামের এক বন্ধুর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু বিয়ে আর কিছুতেই হচ্ছে না। এদিকে বন্ধুটি প্রায় বিয়ে-পাগলা হয়ে উঠেছে। চারদিকে পাত্রী দেখে বেড়াচ্ছে।

একদিন গঙ্গারাম তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল 'কী ব্যাপার, বল, দেখি। তোমার বিয়েটা হচ্ছে না কেন? বাধাটা কোথায়?'

বন্ধু বলল, 'ভাল পাত্রী পাচ্ছি না।'

গঙ্গারাম অবাক, 'সে কী এত মেয়ে দেখছ কোনও মেয়েই পছন্দ হচ্ছে না। তুমি কি ডানাকাটা পরী খুঁজছ নাকি?'

বন্ধুটি বলল, 'আমি যে খুব সুন্দরী মেয়ে খুঁজছি তা নয়। বেশ একটু স্মার্ট, ঝকঝকে মেয়ে হলেই হবে। কালো হলেও খুব আপত্তি নেই। তবে....'

গঙ্গারাম জিজ্ঞেস করলে, 'তবে?'

বন্ধু বলল, 'ভাই আমি চাই যে মেয়েটি যেন একটু ভাল গান গাইতে পারে। নাচতে পারে। কথাবার্তা খুব সুন্দর বলে। বেশ সপ্রতিভ হয়, সব বিষয়েই কথা বলতে পারে। খেলাধুলায় চৌখশ হবে, সমাজসেবাতেও উৎসাহী হবে।....'

বন্ধুটি তার ভাবী কাল্পনিক বধূর আরও অন্যান্য গুণের কথা বলতে যাচ্ছিল, গঙ্গারাম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি বুঝেছি তুমি কোনও মেয়েকে নয়, একটা টিভি সেটকে বিয়ে করতে চাও। এ সমস্তই টিভি সেটের মধ্যে পাবে, কোনও একটি মেয়ের মধ্যে কখনই পাবে না।'

গঙ্গারামের প্রত্যাবর্তন

গঙ্গারাম অকৃতজ্ঞ বা বেইমান নয়। তার খবর কাগজে বেরোতেই সে ফিরে এসেছে। এসেই জানাল যে বৌয়ের বেড়ালটা আবার ফিরে এসেছে।

আমি একটু চিন্তিত হয়ে এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় সন্দেহ প্রকাশ করলাম, 'দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে এল বেড়াল? একা একা ফিরে এল? সেই একই বেড়াল তো?'

গঙ্গারাম বলল, 'ওই বেড়াল আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আমার কি সন্দেহ হয় নি ভাবছেন। কিন্তু টেস্ট করে নিয়েছি। সেই সাদা কালো হুলো, সেই কান ছেঁড়া। দামোদর বলে নাম ধরে ডেকে দেখেছি, 'হুম-হু' করে আগের

মতোই। তবে আমার দিকে খুব কটমট করে তাকায়, রীতিমত ভয় হয়।'

আমি আবার বললাম, 'কিন্তু এ তো খুবই আশ্চর্য কাণ্ড। ফিরল কি করে? তাছাড়া তোমার সেই পঁচিশ হাজার টাকার পুরস্কারের ব্যাপারটা আছে।'

এ বিষয়ে গঙ্গারাম সেয়ানা। সে বলল, 'বেড়াল তো একা একা ফিরে এসেছে। কেউ তো খুঁজে দেয়নি। পুরস্কারের পঁচিশ হাজার টাকা রক্ষা পেয়েছে।'

এইসময় শিবরাম চক্রবর্তীর একটা পুরনো গল্প আমার মনে পড়ল। বাড়ির পাজি বেড়াল যেখানেই ফেলে দিয়ে আসা হোক আবার ফিরে আসে। অবশেষে বেড়াল যাতে দেখতে না পায় কোন পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেইজন্য, ফাঁকফোকরহীন একটা মোটা চটের থলির মধ্যে শক্ত করে মুখ বেঁধে এ গলি ও গলি, এপাড়া ওপাড়া নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে একেবারে শহরের অন্য প্রান্তে সম্পূর্ণ অচেনা একটা এলাকায় বেড়ালটাকে ছেড়ে দেওয়া হল। এবার বিপদ হল তাদের যারা বেড়াল ফেলতে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে, বাড়ির পথ আর খুঁজে পায় না। তখন কি আর করবে, সেই ফেলে দেওয়া বেড়ালের পিছু পিছু তারা রওনা হল এবং যথাসময়ে বাড়ি ফিরে বেড়ালটাকে অনুসরণ করে।

আমি গঙ্গারামকে এই গল্পটা বললাম। সে বলল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কি মনে হচ্ছে?'

গঙ্গারাম বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, আমি হাওড়া স্টেশনে নেমে যাওয়ার পর কেউ বেড়ালের থলেটা কামরার বেঞ্চির নিচে দেখতে পেয়ে সেটা প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে দেয়। তারপর থলে আঁচড়ে-কামড়ে ছিঁড়ে বেড়ালটা বেরিয়ে এসেছে। কিংবা প্ল্যাটফর্মের কোন যাত্রী কৌতূহলবশত ব্যাগটা খুলে হয়ত তারপর ছেড়ে দিয়েছে বেড়ালটাকে। এরপর বেড়াল নিজেই হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে কলকাতায় ঢুকে দুয়েকদিন এদিক ওদিক বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে।'

বেড়াল এবং গঙ্গারাম দুটোই আমার প্রিয় বিষয়। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে।

বেড়ালের অন্য একটা গল্প দিয়ে, যে গল্পে গঙ্গারাম রয়েছে সেই আখ্যান দিয়ে এ যাত্রা শেষ করি।

বলাবাহুল্য গল্পটি অতিরঞ্জিত। কিন্তু সম্পূর্ণ বানানো নয়, একটু সত্যতা আছে।

গঙ্গারামের স্ত্রী নানা রকমের রান্না করতে ভালবাসে, সেটাই স্বাভাবিক। গঙ্গারাম আবার স্ত্রীর রান্না পছন্দ করে না, সেটাও স্বাভাবিক।

সেদিন গঙ্গারামের স্ত্রী একবাটি পায়েস বানিয়েছে। পায়েসটা গরম ছিল তাই সেটা ফ্রিজে ঢোকাতে পারেনি। ফ্রিজের ওপরে রেখে দুপুরে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখে যে পুরো পায়েসটা দামোদর বেড়াল চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছে।

সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে গঙ্গারাম দেখে যে বউ হাপুস নয়নে কাঁদছে। সব শুনে সে বউকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তুমি কেঁদো না। আমি তোমাকে শিগগিরই আরেকটা বেড়াল এনে দেব।'

এই প্রতিশ্রুতির ব্যঞ্জনা, আশা করি, পাঠিকাদেবী বুঝতে পেরেছেন। গঙ্গারাম ধরেই নিয়েছে যে তার স্ত্রীর রান্না পায়েস খেয়ে বেড়ালের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়েছে। কি সাংঘাতিক।

পুনশ্চ :

এই ঘটনার কিছু আগের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

গঙ্গারাম তার স্ত্রীর নিজের হাতে তৈরি কেকের একটা টুকরো আমার

জন্য নিয়ে এসেছে। কেকটা মুখে দিয়ে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ পেলাম, গঙ্গারামকে বললাম, 'ইঁদুরের গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে।'

গঙ্গারাম বলল, 'কি যে বলেন? ইঁদুর আসবে কোথা থেকে? সারারাত দামোদর বেড়ালটা কেকের ওপর শুয়ে ছিল। ইঁদুর সাহস পাবে কি করে?'

লটারি

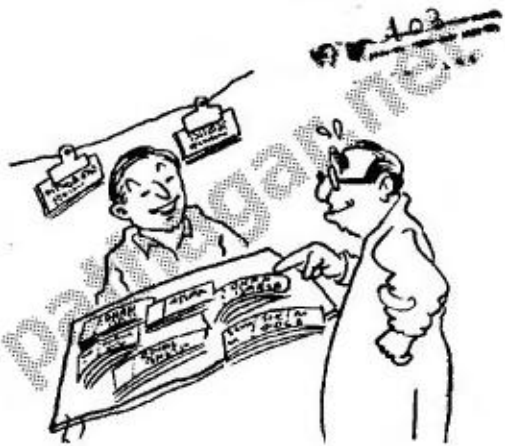

লটারি ব্যাপারটা আমরা সকলেই জানি। লটারির টিকিট কখনও কাটেনি এমন লোক বিরল। আমি নিজেতো একসময় অনেক কেটেছি। অফিসে একটি দুঃস্থ যুবক আসত, কিছুটা তাকে সাহায্য করার জন্যে, কিছুটা নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে তার কাছ থেকে টিকিট কিনতাম।

টিকিট কিনতাম বটে কিন্তু কোনওদিন কোনও প্রাইজ পাইনি, দশ টাকার পুরস্কারও নয়। শুধু লটারি কেন, বালক বয়সের পরে জীবনে তেমন কোনও পুরস্কারই আমি কখনও পাইনি।

ভাগ্য কিংবা যোগ্যতার অভাবের গ্লানি নিয়ে এই রম্য নিবন্ধে আক্ষেপ করব না। বরং গল্প বলি।

সত্যি কথা বলতে কি, একেবারেই যে কোনও পুরস্কার পাইনি, ঘটনা তেমন নয়।

একবার 'বিশ্ব সাহিত্য সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আমাকে 'শতাব্দীর সেরা সাহিত্যিক' পুরস্কার দেয়। তবে তাদের পুরস্কার পেতে গেলে তাদের সমাজের সদস্য হতে হয়। সদস্য চাঁদা পাঁচশো টাকা, পুরস্কারের অর্থমূল্য একশো টাকা। কঠোর দারিদ্রের কারণে আমার পক্ষে সে পুরস্কার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

আরেকবার লটারির এক প্রাইজ পেয়েছিলাম। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার।

সবাই জানেন মাতালদের সম্পর্কে আমার বিষম দুর্বলতা। শুধু মাতালদের নিয়ে একটি আদ্যোপান্ত গল্পের বই আমি ছাড়া আর কে লিখেছে?

একবার বিপদে পড়েছিলাম। কোথায় যেন মদ ও মাতাল নিয়ে একটি লাগসই রচনা লিখেছিলাম।

লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনদিনের মাথায় ক্যুরিয়ার যোগে একটি খাম পেলাম। একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি, লিখেছেন শ্রীমতী মদালসা পানিগ্রাহী, আসানসোল থেকে।

শ্রীমতী লিখেছেন যে আমার রচনাটি পাঠ করে তিনি এতই সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, 'এই চিঠির সঙ্গে স্থানীয় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের লটারির একটা টিকিট আমি আপনাকে উপহার পাঠাচ্ছি।'

টিকিটে দেখলাম প্রথম পুরস্কার একটি খাসি, দ্বিতীয় পুরস্কার দুটি মোরগ, তৃতীয় পুরস্কার এক কেজি রসগোল্লা।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছিলাম, একটি জলজ্যান্ত খাসি।

না। সে খবর শ্রীমতী মদালসা জানানোর পর সেই খাসি আনতে আমি যাইনি।

আসানসোল থেকে একটা খাসি ট্রেনে কিংবা অন্যভাবে কলকাতায় আনা এবং যথাসময়ে তার সদ্ব্যবহার করার এলেম আমার নেই, তা আমি ভাল করে জানি। শ্রীমতীকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছি। এখন ভয় হচ্ছে তিনি স্বয়ং খাসিটিকে নিয়ে আমার বাসায় চলে না আসেন।

সে যা হয় হবে। এদিকে লটারির এখন বেশ খারাপ সময়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই লটারিকে নিষিদ্ধ করতে চাইছেন। লটারি খেলে নাকি বহু দরিদ্র পরিবার সর্বস্বান্ত।

পুনশ্চ :

অবশেষে গঙ্গারামকে নিয়ে একটা গল্প বলি।

গঙ্গারামের সব গল্পই তো সুপ্রাচীন এবং অবশ্যই আমারই আগের রচনা থেকে নেওয়া। সেইজন্যে গঙ্গারামের কাহিনীর কখনও অভাব হয় না।

এবারের কাহিনীটি লটারি খেলার। ইনস্ট্যান্ট খেলা, সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্ট এবং জয়লাভ হলে প্রাপ্তি, একধরনের জুয়া বলা চলে। হাটে-বাজারে মেলায় এরকম জুয়ার বোর্ড বসে।

ঘটনা বলি।

গঙ্গারাম আমার মতো দুর্ভাগা নয়। সে দুটো লটারির টিকিট কিনেছিল। সেদিন এসে বলল, 'দাদা, পাঁচ হাজার টাকার থার্ড প্রাইজ পেয়েছি।'

গঙ্গারাম কথাটা বলল বটে কিন্তু তার মুখভাব দেখে মনে হল সে মোটেই খুশি নয়।

তাকে বললাম, 'কি ব্যাপার? পাঁচ হাজার টাকা মুফতে এল তবুও খুশি নও?'

সে বলল, 'একটা টিকিটে তো প্রাইজ পেলাম, পরের টিকিটটা শুধু শুধু গচ্চা গেল, তাই ভাবছি।'

চাকরি

যিনি যত বড় চাকরিই করুন তিনি যেন ভুলে না যান যে চাকরি শব্দটি এসেছে চাকর থেকে।

শব্দটি কুলীন, বাংলায় এজাতীয় অধিকাংশ শব্দের মতোই, এসেছে ফারসি থেকে।

বহুবচনে, অবহেলার্থে চাকর শব্দ চাকর-বাকর হয়ে বঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সে যা হোক, চাকর শব্দের অভিধানগত মানে ভৃত্য, পরিচারক। সেদিক থেকে চাকরি শব্দের অর্থে কিঞ্চিৎ মর্যাদা আছে। এর অর্থ হল বেতন নিয়ে কাজ করা।

বেতনভোগী যে কোনও কর্মচারীই চাকর। ইংরেজীতে তাই Servent, সরকারি চাকরি করলে Government Servent। অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে চাকরের বদলে চাকুরে বা চাকরে, সারভ্যান্টের বদলে সার্ভিস-হোলডার ইত্যাদি সম্মানজনক শব্দ প্রচলিত হয়েছে। সেকালে মানে এই পঞ্চাশ বছর আগেও সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী পর্যন্ত কাউকে চিঠি লিখলে চিঠির নিচে সই করার আগে লিখতেন, 'আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ভৃত্য' (Your most obedient servent)। সেই মোস্ট ওবিডিয়েন্টের যুগেও চাকরি সহজলভ্য ছিল না। এখন তো নয়ই।

চিরকালই চাকরি অতি সাংঘাতিক জিনিস। একটি চাকরি পাওয়া কত কঠিন সেটা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। কেউ চাকরি পেলে, কি করে পেল সেই প্রশ্নটাই মনে প্রথম উদয় হয়।

চাকরি করাও কম কঠিন নয়। চাকরি রক্ষা করা আরও কঠিন। ওপরওলাকে ভয় ভক্তি করে এবং যথাসাধ্য এড়িয়ে, অধস্তন কর্মচারীদের মন যুগিয়ে এবং সর্বোপরি খল এবং সরল, মাতাল এবং ন্যালাখ্যাপা সহকর্মীদের বশে রেখে বছরের পর বছরের কাজ করে যাওয়া কম কথা নয়।

আকি কিন্তু করেছিলাম। একুশ বছর থেকে ষাট বছর টানা চল্লিশ বছর দম বন্ধ করে। মাথা নিচু করে চেনে বাঁধা ক্রীতদাসের চরিত্রে অভিনয় করেছি।

আজকাল কেউ বিশ্বাস করবে না, এম.এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সরাসরি দরখাস্ত করে নিকট মফস্বলে একটি শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলাম।

অকুস্থলে বাড়ি ঘর করে প্রায় থিতু হয়ে যাচ্ছিলাম। তারপরেও বছর দুয়েক সেই চাকরির লেজ ধরে ঝুলেছি। সেই লেজও অবশেষে খসে গেছে।

শুধু একটা কথা কবুল করি। গত শতকের এক বিখ্যাত ইংরেজ লেখক যিনি আমারই মত সরকারি চাকরি করতেন, তাঁরই মতো চাকরিজীবনের সমস্ত সময় আমি আশঙ্কায় কাটিয়েছি, কি জানি কোথাও কোনও গাফিলতি

হয়েছে কিনা। এমনকি অবসর গ্রহণ করার পরেও আমার অধিকাংশ দুঃস্বপ্নের এটাই নিয়মিত বিষয়।

সমগ্র চাকরিজীবনে সবসময়েই আমার দুশ্চিন্তা ছিল এই বুঝি চাকরি গেল। তা যায়নি, আধা-সরকারি বা সরকারি চাকরি এত সহজে যায় না।

কিন্তু সেদিন গঙ্গারাম এসে আমাকে যখন বলল তার শ্যালকের চাকরি চলে গেছে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি জানতাম গঙ্গারামের শালা বুনো একটা মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করে। সেখানকার চাকরি যাওয়া সোজা কথা নয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার শালা যেন কি কাজ করত?' গঙ্গারাম বলল, 'বুনো ছিল মজিলনগর মিউনিসিপ্যালিটির ডগ ক্যাচার, রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর ধরত।'

আমি বললাম, 'সে চাকরি গেল কি করে?

গঙ্গারাম বলল, 'বুনোটা এক নম্বরের বোকা। কাজে কেরামতি দেখাতে গিয়ে রাস্তার সব কুকুর ধরে ফেলল, তারপর আর চাকরি থাকে কি করে?'

পুনশ্চ :

এই কর্ম-সংস্কৃতির বাজারে একটা দামি কথা বলি, 'চাকরি করা আর কাজ করা এক কথা নয়।'

এই পুরনো পাপীর একটা পুরনো কাহিনী শুনুন। একদা এক অফিস পর্যবেক্ষণে গিয়ে সেখানকার বড়কর্তাকে যথারীতি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, 'এই অফিসে কতজন লোক কাজ করে।'

অম্লান বদনে বড় কর্তা বললেন, 'শতকরা পঁচিশ, বড়জোর তিরিশ জন।' আমি কিন্তু যা জানতে চেয়েছিলাম সেটা হল কর্মচারীর সংখ্যা।

গঙ্গারাম বনাম তারাপদ

দশ-বারো সপ্তাহ দেশে ছিলাম না। এর মধ্যে বিশেষ কেউ আমার খোঁজ করেনি কিন্তু গঙ্গারামের খোঁজ করেছে।

গত মঙ্গলবারের কাগজে স্বয়ং নির্বাহী সম্পাদক মহোদয় কবুল করেছেন, অনেক পাঠকই তাঁকে বিরক্ত করছেন, জানতে চাইছেন, 'গঙ্গারামের কি হল? গঙ্গারামের কি খবর?'

এতো সেই বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির দশা। এখন আমার অগোচরে গঙ্গারাম আমার চেয়ে ঢের বেশি বিখ্যাত, ঢের বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছে। কেউ আমার খবর নিচ্ছে না, এদিকে গঙ্গারামের জন্যে অস্থির।

গঙ্গারামের খোঁজ লাগালাম। কোথাও তার দেখা পাচ্ছি না, কোনও সংবাদও পাচ্ছি না। তবে একটা উড়ো খবর পেলাম, শ্রীমান আমার অনুপস্থিতিতে একদিন কাগজের অফিসে এসেছিল। সম্পাদকীয় দপ্তরে নয়। বিজ্ঞাপন বিভাগে। সেখানেও নাকি তার গুণগ্রাহী আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ গঙ্গারামকে চিনে ফেলে। তাতে অবশ্য তার কিছু আসে-যায় না, সে নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে উদাসীন।

সে যা হোক, সেদিন গঙ্গারাম 'হারানো-প্রাপ্তি'র কলামে একটা ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিতে এসেছিল। বিজ্ঞাপনটির বয়ান এই রকম—

'একটি পূর্ণ বয়স্ক, মোটাসোটা, কান ছেঁড়া, সাদা-কালো হলো বেড়াল গত শনিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ। বেড়ালটির নাম দামোদর।

উপরিউক্ত দামোদরকে নাম ধরে ডাকলে সে 'হুম হু' বলে সাড়া দেয়।

দামোদর বিছানায় শুতে ভালবাসে। ঘন দুধ এবং মাছের পেটি ছাড়া খায় না। ইঁদুর দেখলে সে ভয় পায়।

যদি কেউ দামোদরকে খুঁজে দিতে পারেন তাঁকে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার হাতে-হাতে দেওয়া হবে।'

এই বিজ্ঞাপনের খসড়াটি পাঠ করে বিজ্ঞাপন বিভাগের কেউ বোধহয় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'সামান্য একটা বেড়াল খুঁজে দেওয়ার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা!'

শোনা যায়, এই বিস্ময়োক্তি শুনে গঙ্গারাম মুচকি হেসেছিল, তারপর বলেছিল, 'পঁচিশ হাজার টাকার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ও টাকাটা আমার খরচ হবে না।'

তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে সে জানায়, 'বেড়ালটা আমার নয়, আমার স্ত্রীর। ছোটবেলায় একটা বেড়াল আমাকে কামড়িয়ে দিয়েছিল, সেই থেকে বেড়াল আমার দু চোখের বিষ। এদিকে আমার স্ত্রীর বেড়াল-অন্ত প্রাণ। এই কানছেঁড়া হুলোটা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছে। রাতে বিছানায় আমার বালিশে জোর করে শোয়, তাড়াতে গেলে শয়তানটা ফ্যাঁচ করে ওঠে। মাছের বড় টুকরো, দুধের সর এ সব না হলে তার চলে না।'

এই পর্যন্ত শোনার পর শ্রোতা বলেছিলেন, 'তা হলে বেড়ালটা পালিয়ে

যাওয়ায় আপনি বেশ খুশি হয়েছেন।'

এবার আরও গলা নামিয়ে গঙ্গারাম বলেছিল, 'বেড়ালটা এত সুখ ছেড়ে কোন দুঃখে পালাতে যাবে!'

বিস্মিত শ্রোতার 'তা হলে' জিজ্ঞাসায় তখন গঙ্গারাম নাকি বলে, 'পালাবে কেন, ওটা আমি স্বহস্তে পাচার করেছি। গত শনিবার বিকেলে আমার স্ত্রী গিয়েছিলেন বাপের বাড়ি। সেই সুযোগে বেড়ালটাকে ধরে বাজারের থলের মধ্যে ঢুকিয়ে, সেই থলের মুখটা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা ট্যাক্সি করে হাওড়া স্টেশনে চলে যাই। রাজধানী এক্সপ্রেস তখন ছাড়ে ছাড়ে, একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে স্টেশনে ঢুকে একটা কামরায় ঢুকে বেঞ্চির নিচে থলেটা রেখে দিলাম। বেড়ালটা মাঝে মধ্যে মিউ মিউ করছিল, গাড়ি ছাড়ার হই হট্টগোলে সেটা বোধগম্য ছিল না। গাড়ি দু-মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিল। আমিও লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম। এর পরের স্টেশন ধানবাদ, তার আগে শ্রীমান দামোদর পরিত্রাণ পাচ্ছে না। ভাগ্য ভাল থাকলে একেবারে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

স্তম্ভিত শ্রোতা বললেন, 'তবে এই বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছেন কেন?'

গঙ্গারাম হেসে বলেছিল, 'মিসেসকে খুশি করার জন্যে। তাছাড়া আমার তো কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। ওই বেড়াল তো আর ফেরত আসছে না।'

হস্তাক্ষর

অহংকার করার মতো খুব বিশেষ কিছু আমার নেই। সাদামাটা জীবন ও জীবিকা, সাদামাটা রচনা। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার একটু অহংকার আছে। সেই একটা জিনিস, যা আমি পারি কিন্তু অন্যেরা পারে না। পারলেও বহুকষ্টে, গলদঘর্ম হয়ে তবে পারে।

সম্পাদক মহোদয়, প্রুফ রিডার, কম্পোজিটরবাবু এ-ব্যাপারে সবাই আমার হয়ে সাক্ষ্য দেবেন অন্তত একটা বিষয়ে।

বিষয়টা আর কিছু নয়, আমার হাতের লেখা। তার পাঠোদ্ধার করা খুব

কঠিন, সে আমি একাই পারি, আর কেউ পারে না। এটা একটা কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়, আমার হস্তাক্ষর আমি একাই পড়তে পারি।

অবশ্য এ ব্যাপারে আমার চেয়েও তালেবর ব্যক্তি আছেন।

পথ দুর্ঘটনায় এক কেসে একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে থানায় নিয়ে এসে তাঁর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। দারোগাবাবু তাঁর সব কথা শুনে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন। লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি সেই জবানবন্দি সাক্ষীকে দেখিয়ে বলেন, 'ভাল করে পড়ে সই করুন।'

তখন সেই সাক্ষী বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না। আপনি পড়ে শোনান।' ভদ্রলোকের বুক পকেটের কলমের দিকে তাকিয়ে হতাশ দারোগাবাবু বললেন, 'তাতে কি লাভ হবে? আপনি তো সই করতে পারবেন না।'

সাক্ষী বললেন, 'তা পারব। আমি সই করতে পারি। সেটুকু শিখেছি। দেখেছেন পকেটে কলম আছে।'

এবার দারোগাবাবু ডায়েরিটা এগিয়ে দিয়ে জবানবন্দির নিচে একটা সাদা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এখানে সই করুন।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বুক পকেট থেকে দামি কলম বার করে খসখস করে নিজের নাম সই করলেন। কিন্তু বড় অস্পষ্ট সেই সই। সেই স্বাক্ষর অনুধাবন করে বলা অসম্ভব স্বাক্ষরকারীর কি নাম। মসীরঞ্জিত চরণে

আরশোলা হেঁটে গেলে যেমন হয় এই নামসই অনেকটা সেই রকম।

দারোগাবাবু স্বাক্ষর থেকে সাক্ষীর নাম উদ্ধার করতে না পেরে তাঁকে বললেন, 'আপনার সই দেখে আপনার নামটা তো পড়তে পারছি না।'

'আমিও পারছি না,' ভদ্রলোক ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম, আমি পড়তে পারি না।'

এতো তবু এক হতভাগ্য অশিক্ষিত ব্যক্তির কথা। শিক্ষিত ব্যক্তিদের হাতের লেখাও কিছু কম খারাপ হয়না।

আমার এক সহপাঠী বন্ধু ছিলেন ডাকসাইটে ভাল ছাত্র। সেকালের আই.এ, মানে ইন্টারমিডিয়েট আর্টস (এখনকার উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল্য) পরীক্ষায় সে প্রথম হয়েছিল। কিন্তু তাঁর হাতের লেখা ছিল যাচ্ছেতাই, তার পাঠোদ্ধার করা ছিল অসম্ভব।

বি. এ. ক্লাসের টিউটোরিয়ালে অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর খাতা দেখে বলেছিলেন, 'কিছুই তো পড়তে পারলাম না।' তারপর মৃদু হেসে মন্তব্য করেছিলেন, 'তোমার ভাল রেজাল্টের রহস্য আমি ধরতে পেরেছি।'

আমরা সমবেতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'রহস্যটা কি স্যার?'

হরপ্রসাদ বলেছিলেন, 'ও তো শতকরা আশি ভাগ নম্বর পেয়েছে। বিশ ভাগ বাদ গেছে ওর লেখা যেটুকু পড়া গেছে তার জন্যে, আর যেটুকু পড়া যায়নি সে জন্যে আশি করে পেয়েছে।'

অধিকাংশ উকিল-ডাক্তারের এমনকি লেখাই যাদের পেশা সেই সাংবাদিক-সাহিত্যিকদের অনেকের হাতের লেখাই অপাঠ্য।

ডাক্তারবাবুর হাতের লেখা নিয়ে একটি বহু প্রচলিত গল্প আছে। এক ওষুধের দোকানদার ডাক্তারবাবুর বিশেষ বন্ধু। রোগিরা সেই দোকান থেকেই ওষুধ কেনে। সেই ওষুধ ব্যবসায়ীর একটি ফ্ল্যাট বাড়ি আছে, সেখানে একটি ফ্ল্যাট খালি হয়েছে। ডাক্তারবাবুর ঘনিষ্ঠ এক রোগি তাঁকে ধরেছে ওষুধ ব্যবসায়ীকে অনুরোধ করতে যাতে সে ফ্ল্যাটটি পায়। ডাক্তারবাবু ভাল লোক। খসখস করে তাঁর প্যাডে সেই ওষুধ ব্যবসায়ীকে একটা চিঠি লিখে দিলেন।

সেই চিঠিটা নিয়ে ওষুধের দোকানে সেই ব্যবসায়ীর হাতে দিতেই তিনি চিঠিটায় একটু চোখ বুলিয়ে পত্রবাহককে বললেন, 'একটু বসুন।'

মিনিট কয়েক অপেক্ষা করার পর পত্রবাহককে ডেকে তিনি তাঁর হাতে একটা ওষুধের শিশি ধরিয়ে দিলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'ডাক্তারের

হাতের লেখা পড়া খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ওষুধের নামটা পড়তেই পারছিলাম না।'

এটা যে একটা চিঠি, প্রেসক্রিপশন নয়, ডাক্তারবাবুর হাতের লেখার গুণে সেটা পর্যন্ত ধরতে পারা যায়নি।

গঙ্গারাম ও বিশসোকাপ

আজ কয়েকদিন হল গঙ্গারাম বিশ্বকাপ নিয়ে আমাকে খুব অত্যাচার করছে।

প্রথমদিন এল ভারি গোলমেলে সমস্যা নিয়ে, বলল, 'দাদা বিশ্বকাপ এক বচ্ছর আগে খেলা হচ্ছে কেন?'

তার প্রশ্নটার একটা সূক্ষ্ম প্যাঁচ আছে, সেটা ধরতে আমার একটু সময় লাগল। সে আসলে 'বিশ্বকাপ' বলছে না, বলছে 'বিশসো কাপ'।

বিশ শো মানে দু'হাজার, সে হল সামনের বছর, আরেক ইই হট্টগোল হুজুগের ব্যাপার। কিন্তু এ বছর হল উনিশশো নিরানব্বুই। গঙ্গারামের মতে, 'এ খেলাকে বিশসো কাপ না বলে নিরানব্বুই কাপ বলা উচিত।'

আমার মুখ ভাব দেখে গঙ্গারাম বলল, 'অবশ্য ধাক্কাকাপও বলা যেতে পারে।'

আমি বললাম, 'ধাক্কাকাপ কেন? এ তো ক্রিকেট খেলা, ফুটবল নয় যে, বিস্তর ধাক্কাধাক্কি থাকবে।'

গঙ্গারাম গম্ভীরভাবে বলল, 'সে জন্যে নয়, ওই যে নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা বলে একটা কথা আছে না, সেই অর্থে বলছিলাম।'

আমি এবার বাধ্য হয়ে গঙ্গারামকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'তুমি এই যে বারবার বিশ্বকাপকে বিশসো কাপ বলছো, এ কথাটা তো আমি আগেরবার লিখেছিলাম।'

গঙ্গারাম অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 'তাই নাকি?'

আমি গঙ্গারামকে বললাম, 'তাই নাকি—আবার কি? তুমি জান না গত

বছর ফুটবলের বিশ্বকাপের সময় যখন আমরা রাত জেগে গামলার পর গামলা চা খেতাম, আমাদের কাজের মেয়ে বাসনার ধারণা হয়েছিল যে খেলাটার নাম বিশসো কাপ এই জন্যে যে এই খেলা দেখতে প্রত্যেককে বিশসো অর্থাৎ দু'হাজার কাপ খেতে হয়। এবং সত্যিই তাই হল। বাসনা মনে মনে কি একটা হিসেব রেখেছিল, একদিন চা দেওয়ার সময় বাসনা ঘোষণা করল, 'বিশসো কাপ হয়ে গেছে।' এবং সত্যিই সেদিন বিশ্বকাপ শেষ হল।'

গঙ্গারাম চুপ করে গেল দেখে আমি তাকে বললাম, 'বিশ্বকাপের হালচাল কি বুঝছো?'

গঙ্গারাম বলল, 'এর আবার হালচাল কি? রীতিমত হুজুগ, দুর্গাপুজোর মত।'

আমি বললাম, 'তার মানে, হই চই, হট্টগোল, জয়-পরাজয়, ধুন্দুমার কাণ্ড, তারপর আসছে বছর আবার হবে।'

কি সব চিন্তা করে গঙ্গারাম এবার বলল, 'জানেন এবার বিশ্বকাপ দেখতে বিলেত যাওয়ার খুব সুবিধে ছিল।'

'কি রকম সুবিধে?' আমি অবাক।

গঙ্গারাম বলল, 'মোটরগাড়ি, টিভি এমন কি ঠাণ্ডা পানীয় পর্যন্ত যাই

কিনুন সঙ্গে বিলেত যাতায়াতের ফ্রি টিকিট লটারিতে দিচ্ছে।'

আমি বললাম, 'কেউ পেয়েছে?'

গঙ্গারাম বলল, 'নিশ্চয়ই পেয়েছে।'

আমি জানালাম, 'শুধু প্লেনের টিকিট পেলেই তো হবে না। সস্তার হোটেলে আধপেটা খেয়ে থাকলেও সব মিলিয়ে দৈনিক খরচ অন্তত ষাট পাউণ্ড মানে চার হাজার টাকা। সে খরচা কে দেবে?

খুব চিন্তিত দেখাল গঙ্গারামকে। আমার ঘরে টিভিতে প্রাক বিশ্বকাপ ক্রিকেট মহড়া দেখাচ্ছিল, সেটা দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ আধ ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম থেকে উঠে সে জোর হাততালি দিতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে তাকে বললাম, 'কি যা-তা হাততালি দিচ্ছো, এখন আর ক্রিকেট হচ্ছে না, টিভিতে গোখাদ্য ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।'

গঙ্গারাম বলল, 'আমি কি আর ক্রিকেট নিয়ে হাততালি দিচ্ছি। আমি হাততালি দিচ্ছি আমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে। দাদা, আপনার বিশসো কাপ চায়ের এক কাপ এখনই হয়ে যাক না।'

আজি হতে শতবর্ষ আগে

'আজি হতে শতবর্ষ পরে' লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নবতম গ্রন্থটির নাম 'আজি হতে শতবর্ষ আগে'।

চৌধুরী মহোদয় যথেষ্টই রবীন্দ্রভক্ত এবং বিরোধাভাসের প্রতি তাঁর প্রবণতা এই গ্রন্থের নামকরণে সহায়ক হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও স্মরণীয় যে একশো বছর অতিক্রান্ত নীরদচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের নামকরণে শতবর্ষ কথাটি ব্যবহার করতেই পারেন।

আমাদের বাল্যকালে প্রবীণ-প্রবীণারা আশীর্বাদ করার সময় বলতেন, 'শতায়ু হও'। আজকাল এটা আর চল নেই। আশীর্বাদ করাটাই তো উঠে

গেছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম, সেও খুব কমে গেছে। নমস্কারের বিনিময়ে তো আর আশীর্বাদ হয় না।

সে যা হোক, আমাদের জ্ঞাতসারে নীরদচন্দ্র চৌধুরী একমাত্র ব্যক্তি যিনি সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে শতায়ু হয়েছেন।

এমনিতে অনেক শোনা যায়, অনেক খবর পাওয়া যায় দীর্ঘজীবীদের। কাশ্মীরে দুই ভাইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের দু'জনেরই বয়স সোয়াশো বছরের বেশি। কিংবা নগেন ডাক্তারের দিদিমার বয়স একশো দশ হল। এসব কিন্তু তলিয়ে দেখলে ধোপে টেঁকে না। একটু খোঁজখবর করলে স্পষ্ট হয় যে এদের কারও বয়সই একশো পেরোয়নি।

তাই বলে কেউ কি একশো বছর বয়স পেরোয় না? নীরদচন্দ্র চৌধুরীই তো পেরিয়েছেন।

কিন্তু একশো বছর, বেঁচে থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিলিতি নোটবুকে অবশ্য আছে যে শতায়ু হওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়, বেশ সোজা। তোমাকে প্রথমে নিরানব্বই বছর বাঁচতে হবে এবং তার পরের বছরটা খুব সাবধানে থাকতে হবে।

এরই পাশাপাশি আরও একটা গোলমেলে উপাখ্যান আছে।

বাংলা সাহিত্যের ক্লাসে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য পড়ানো হচ্ছে। পড়াতে

পড়াতে অধ্যাপক মহোদয় খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন, ছাত্রদের বলছেন, 'আজ যদি মহাকবি মধুসূদন বেঁচে থাকতেন; অত বড় প্রতিভা। দলে দলে মানুষ তাঁকে দেখতে যেত।'

এইখানে একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন আজ মধুসূদন বেঁচে থাকলে তাঁর পৌনে দুশো বছর বয়স হত। তাঁকে দেখতে দূর-দুরান্ত, দেশ-বিদেশ থেকে লোকের ভিড় হত।'

সত্যিই তাই। কেউ দেড়শো, দুশো বা ততোধিক বছর যদি বাঁচেন, তাঁকে কবি, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক না হলেও চলবে, নিতান্তই সুদীর্ঘকাল দেহরক্ষা করেছেন এই সুবাদে তিনি সশরীরে দ্রষ্টব্য হবেন।

অবশ্য নীরদচন্দ্র চৌধুরী দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন বলেই এত গুরুত্ব পেয়েছেন তা নয়। তাঁর মনন ও চিন্তার স্বকীয়তা গত পঞ্চাশ বছর ধরে, বিশেষ করে, 'Autobiography of an unknown Indian' প্রকাশের পর থেকে বহুবারই তাঁকে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

এই তো সেদিন 'তথাকথিত বাংলাদেশ' লিখে তিনি গোলমাল বাঁধালেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁর রচনা নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হল।

কিন্তু নীরদচন্দ্র সত্যিই কি বাংলাদেশ বিরোধী বা বিদ্বেষী?

'আজি হতে শতবর্ষ আগে' গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন,

'আমি পূর্ববঙ্গের লেখক। আমি কখনও কলিকাতাকেও নিজের দেশ বলে মনে করি নাই। কলিকাতায় আসিয়াও আমি মনে করিয়াছি, আমি যেন প্রবাসী। সেই ১৯১০ সনে কিশোরগঞ্জ ছাড়িয়া আসিয়াছি তারপর কোথাও যেন দেহমনের জন্য সত্যকার একটা বাসস্থান পাইলাম না।'

কিন্তু এটাই নীরদচন্দ্রের শেষ কথা নয়। স্ববিরোধিতার তিনি উজ্জ্বল উদাহরণ। এই বইয়েরই অন্যত্র তিনি লিখেছেন—

'কিশোরগঞ্জে ঠিক যেন নিজের বাড়ি মনে হইত না। কলিকাতায় আসিলে আমাদের আসল মানসিক জীবন বা আসল জীবন পাইলাম মনে করিলাম।'

শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' গ্রন্থটির প্রতি আমার দুর্বলতা নিতান্ত ব্যক্তিগত।

স্বাধীনতাপূর্ব অবিভক্ত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জেলাটি ছিল, ময়মনসিংহ। এই ময়মনসিংহ জেলারই দুই প্রান্তে কিশোরগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল মহকুমা।

নীরদচন্দ্র কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরের লোক। তিনি ১৯১০ সালে

কিশোরগঞ্জ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। এবং একচল্লিশ বছর পরে ১৯৫১ সালে আমি টাঙ্গাইল থেকে কলকাতায়।

বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, খ্যাতিতে, বয়েসে তো বটেই তিনি আমার থেকে বহুক্রোশ এগিয়ে। বস্তুত তিনি আমার স্বর্গত পিতৃদেবের চেয়েও এগারো বছরের বড়।

আমি আশা করেছিলাম, 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' গ্রন্থে আমি একশো বছর আগের কিশোরগঞ্জের ছবি খুঁজে পাব এবং আমার নিজস্ব স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখব। সেইসব ছোট-বড় নদী, স্টিমারঘাট, বাজার-হাট, উকিলপাড়া, আমলাপাড়া। সেকালের মফঃস্বল শহরগুলির চেহারার খুব ব্যতিক্রম ছিল না।

কিন্তু আমার সে অভিপ্রায় পূরণ হয়নি। এই বইয়ে তিনি তাঁর বাল্যস্মৃতি দায়সারা গোছে বিবৃত করেছেন। বাকি প্রায় সবই চর্বিত-চর্বণ। নিজের চিন্তাই বেশি।

তবু নীরদচন্দ্র কোনও সাধারণ ব্যক্তি নন। মনেপ্রাণে বাঙালি, ধ্যানে-জ্ঞানে ইংরেজ এই কটুভাষী মণীষীর কোনও তুলনা নেই।

পুনশ্চ :

১) দুয়েকটি ছোটখাট ভুল চোখে পড়ল যা নীরদচন্দ্রের পক্ষে বেমানান। যেমন তিনি লিখেছেন, 'বঙ্কিম বাস করিতেন প্রতাপ মল্লিকের গলিতে', প্রতাপ মল্লিক নয় হবে প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'আলিপুর হাইকোর্টে', হাইকোর্ট নয় আলিপুর জজকোর্ট।

২) এই আলোচনার কোথাও নীরদচন্দ্র নামের আগে 'মাননীয়' শব্দটি ব্যবহার করিনি। কিন্তু তিনি ইংরেজ রাজের যে সম্মানে অভিষিক্ত তাতে তাঁর নামের আগে সর্বদাই 'মাননীয়' ব্যবহার করা উচিত ছিল।

চশমা

চশমা নিয়ে অবশ্যই আগে লিখেছি। চশমা নিয়ে না হলেও চোখ নিয়ে

লিখেছি, কোথাও না কোথাও, কখনও না কখনও। স্মৃতিমতী পাঠিকা হয়ত বই খুলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন কোথায় আছে সেই রচনা।

সুতরাং এ বিষয়ে, মানে চোখ কিংবা চশমার বিষয়ে আর কিছু না লেখাই উচিত ছিল। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে, গঙ্গারাম এমন দুটি কাণ্ড করে বসেছে যে এই বিষয়ে কিছু লিখতেই হচ্ছে।

একটু ভূমিকা করে নিচ্ছি। চশমা শব্দটি ফারসি (Persian), চশম থেকে এসেছে, চশম মানে চোখ। সেই সূত্রে চশমখোর মানে যার চক্ষুলজ্জার বালাই নেই, নির্লজ্জ। আমাদের অল্প বয়সে দেখেছি পুরনো যুগের চশমার দোকানের সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা থাকত, 'এখানে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া পাথরের চশমা দেওয়া হয়।'

এই সেই আমলের সাইনবোর্ড যখন কাচের চশমা চালু হয়নি। পাথর কেটে স্বচ্ছ করে চশমার কাচ তৈরি করা হত, অনেকটা আতস কাচের মত। এখনকার চশমার মত সূক্ষ্ম ব্যাপার ছিল না। আমার মায়ের দিদিমার একটা পাথরের চশমা ছিল, যতদূর মনে পড়ে সে চশমা খুব ভারি, ওজনদার ছিল।

আমাদের বাবা-দাদারা বড় হওয়ার আগেই পাথরের চশমা উঠে গিয়ে সেখানে কাচের চশমা চলে আসে। শুধু প্রাচীন যুগের কিছু দোকানের অপরিবর্তিত সাইনবোর্ডে বহুকাল পাথরের চশমা কথাটা লেখা ছিল। এই অল্প কিছুদিন আগেও কোথায় যেন এক মফঃস্বল শহরে এক ভগ্নপ্রায় টিনের চালার গায়ে পাথরের চশমার বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম।

এসব তো পুরনো কথা। আসল কথা এই যে আজ কিছুদিন হল গঙ্গারামের চোখটা গোলমাল করছে। মাঝে-মধ্যেই তার চোখ লাল হয়, একেক সময় চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে।

গঙ্গারামকে একদিন বললাম, 'তুমি ডাক্তার দেখাচ্ছো না কেন? চোখের ব্যাপার অবহেলা করবে না।'

গঙ্গারাম বলল যে, সে চোখের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু সেই ডাক্তারকে আমার কি একটা গল্প বলায় সেই ডাক্তার তার চোখ পরীক্ষা না করে চেম্বার থেকে বার করে দিয়েছেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কোন গল্পটা?'

গঙ্গারাম বলল, 'ডোডো-তাতাইয়ের' সেই গল্পটা যেখানে রোগিকে চোখের ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেছে, 'খালি চোখে কত দূর দেখতে পান?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তখন রোগি বলছে, লক্ষ লক্ষ মাইল দেখতে পাই।' ডাক্তারবাবু অবাক। তখন রোগি বুঝিয়ে বলল, 'খালি চোখে আকাশের চাঁদ-সূর্য-তারা সবই দেখতে পাই।

গঙ্গারাম বলল, 'আমিও ডাক্তারবাবুকে এই একই উত্তর দিয়েছিলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে 'এটা ইয়ার্কি করার জায়গা নয়! বলে ভাগিয়ে দিলেন।'

সব শুনে আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে খগেনবাবুর কাছে পাঠাচ্ছি, নামকরা চোখের ডাক্তার। খগেনবাবু আমার অনেক কালের পরিচিত, পুরনো বন্ধুই বলা যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনও ফাজলেমি করতে যেয়ো না।'

গঙ্গারাম আমার চিঠি নিয়ে চলে গেল।

সেদিনই সকালবেলায় খগেনবাবুর ফোন, 'এ কি রোগি পাঠিয়েছেন?'

আমি বললাম, 'কেন? কি করেছে সে?'

খগেনবাবু বললেন, 'আপনার রোগি অসাধ্য সাধন করেছে। তাকে চক্ষু পরীক্ষার চার্ট পড়তে দিয়েছিলাম, প্রায় কেউই সাত-আট লাইনের পর পড়তে পারে না, অক্ষর গুলিয়ে ফেলে। আর আপনার রোগি পুরো চার্ট ঝরঝর করে পড়ে ফেলেছে। এমনকি চার্টের নিচে যেখানে ক্ষুদে অক্ষরে প্রিন্টেড বাই সানরাইজ প্রেস, ভবানীপুর, ক্যালকাটা লেখা রয়েছে তা পর্যন্ত নির্ভুল পড়েছে। এর চোখের কি চিকিৎসা করব বলুন তো?'

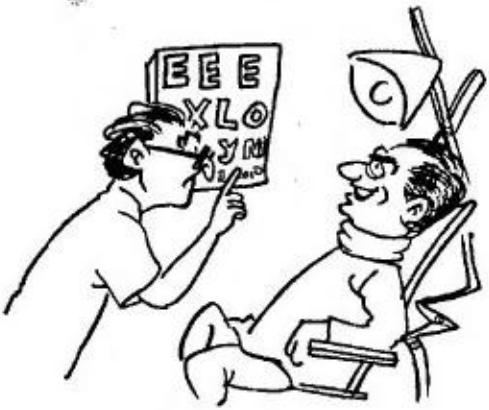

পরের দিন গঙ্গারাম আসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?' গঙ্গারাম গম্ভীরভাবে বলল, 'ও কিছু নয়। আসলে ওই সানরাইজ প্রেসটা ভবানীপুরে আমার মামার বাড়ির একতলায়। ছোটবেলা থেকে চার্টটা দেখে দেখে আগাগোড়া মুখস্থ হয়ে গেছে।

সরল

জগৎ সংসারের সরলতম মানুষটি হল আমার ছোট ভাই বিজন।

নিজের মায়ের পেটের ভাই বলে নিতান্ত গৌরবার্থে এমন কথা বলছি না। আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যাঁরাই বিজনকে চেনেন তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত। বিজনের থেকে বেশি সরল কোনও মানুষ যে আজকের পৃথিবীতে নেই একথা তাঁরা প্রত্যেকেই হলফ করে বলবেন।

অনেক সময় বিজনের নাম ব্যবহার না করেই তার অনেক গল্প ও ঘটনা আমি এখানে ওখানে লিখেছি। সে সব গল্প পুনরায় লেখার কোনও মানে হয় না। তবে যাঁরা এরকম কোনও গল্প আগে পড়েননি, তাঁদের জন্যে, বিশেষ করে বিজনকে বোঝার জন্যে একটা প্রামান্য ঘটনা বলছি।

যে কোনও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মতো প্রত্যেক রবিবার দুপুরে আমরা ভাত-মাংস খাই, এই মাংসটা কিনে দেয় বিজন, এটা তার সাপ্তাহিক পারিবারিক দায়িত্ব। রবিবার সকালে সে চা খেয়ে ব্যাগ নিয়ে নিউ মার্কেটে চলে যায়, এক কেজি মাংস নিয়ে আসে।

এক রবিবার বিজন অনেক বেলায় গলদঘর্ম হয়ে খালি ব্যাগ হাতে ফিরল। এদিকে বাসায় আলু কুটে, পেঁয়াজ-আদা-গরম মশলা বেঁটে রান্নাঘর মাংস রান্নার জন্য প্রস্তুত।

বিজনের শূন্য ব্যাগ দেখে বাড়ি শুদ্ধ সবাই অবাক সে কি মাংস কোথায়?

বিজন বলল, 'মাংস পাওয়া যাবে না। নিউ মার্কেটে পাঠারা স্ট্রাইক করেছে।'

আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। পাঁঠাদের স্ট্রাইক, এরকম কথা তো ভাবা

যায় না। তা ছাড়া স্ট্রাইক করার অধিকার পাঁঠারা কবে অর্জন করেছে।

অনেক পরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছিল, খবরের কাগজের একটা সংবাদ পাঠ করে। সেই সংবাদটি হল, নিউ মার্কেটের মাংস বিক্রেতারা, পাঁঠারা নয়, পুরসভার সঙ্গে কি এক বিসম্বাদে একদিনের হরতাল ডেকেছে।

এই হল আমাদের বিজন। সারল্যের প্রতিমূর্তি।

বিজন আসলে আমার রাঙাপিসিমার মতো। পিসি তখন আমাদের ময়মনসিংহ বাড়িতে। এক রাতে চোর এল জানলার শিক খুলে, বিজনই প্রথম দেখতে পেয়েছিল, সে 'চোর-চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠল, মুহূর্তের মধ্যে আমরা সবাই মিলে 'চোর চোর' করে কোরাস শুরু করলাম। এক নিমেষে চোর উধাও হল।

এরপর পায় আধঘণ্টা প্রবল উত্তেজনা, চোর নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা। অবশেষে আমরা যখন আলো নিবিয়ে শুতে যাচ্ছি তখন রাঙা পিসিমা বললেন, 'চোরেরা নিশ্চয় চোর বললে মনে খুব দুঃখ পায়, তোরা চোর দেখলে ওরকম 'চোর-চোর' করে চেঁচাবি না।'

এইরকম একটি পরিবারের লোক হয়ে আমি এতটা প্যাঁচালো বুদ্ধির হলাম কি করে সেটা গবেষণার বিষয়। অনেকেই এ নিয়ে মাথা ঘামায়, আমি নিজেও ঘামিয়েছি।

পুনশ্চ :

সব ব্যাপারেই গঙ্গারামের একটা নিজস্ব বক্তব্য থাকবেই।

এসব শুনে সে বলল, 'এটা ঠিকই যে আপনি খুব সরল মানুষ নন, আপনার বেশ একটা প্যাঁচ আছে। তবে বিজনদা খুবই সরল মানুষ, আপনার পিসির তো তুলনাই হয় না। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে সরল মানুষ এঁরা নন।'

আমি একটু বোকামি করে ফেললাম, প্রশ্ন করলাম, 'তা হলে কে?'

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমান গঙ্গারাম আমারই একটা পুরনো গল্প আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল।

গঙ্গারাম বলল, 'নৈহাটিতে আমার শ্বশুরবাড়ি। আপনি তো জানেন নৈহাটি ইঁদুরের জন্যে প্রসিদ্ধ?'

আমি বললাম, 'তা জানি না। কিন্তু এর মধ্যে আবার ইঁদুর আসছে কোথা থেকে?'

গঙ্গারাম বলল, 'আরে শুনুন না। শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। নৈহাটি লোকাল ধরব, তাড়াতাড়ি আছে। এদিকে শাশুড়ি ঠাকরুণ অনুরোধ করেছেন, একটি ইঁদুর ধরার খাঁচা কিনে নিয়ে যেতে। বৌবাজারের একটা দোকানে খাঁচা কিনতে ঢুকেছি, সেখানে গাদাগাদি ভিড়। দোকানদারকে বললাম, 'দাদা, একটু তাড়াতাড়ি খাঁচাটা দেবেন, আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।' দোকানদার বললেন, 'হবে না।' সামনের দেয়ালে ঝোলানো ইঁদুরের খাঁচাগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'ওই তো রয়েছে।'

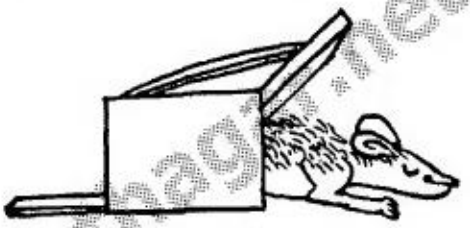

দোকানদার বললেন, 'এগুলোয় নেংটি ইঁদুর, ইঁদুর, বড় জোর ছুঁচো পর্যন্ত ধরা যায় কিন্তু ট্রেন ধরার মতো বড় খাঁচা আমার দোকানে নেই।'

গঙ্গারামের কথা শুনে আমি বললাম, 'এ তো আমার পুরনো গল্প।'

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে গঙ্গারাম বলল, 'তা হোক। তবুও বলুন দাদা, যে লোকটা ভাবছে খাঁচায় ট্রেন ধরার কথা, তার চেয়ে সরল লোক আর হয়? বিজনদাও এত সরল নয়।'

103

মদমত্ত

একটা মামলার প্রয়োজনে একটা জেলা শহরে যেতে হয়েছিল। যথারীতি জেলা আদালতের উঠোনে এবং গেটের পাশে অনেকগুলি ভাতের হোটেল, পান-সিগারেট এবং মিষ্টির দোকান। এরই মধ্যে সবচেয়ে বড় মিষ্টির দোকানটায় গিয়ে দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা এখানে সবচেয়ে বড় উকিল কে? আমি বাইরে থেকে এসেছি, একটু জানতে পারলে উপকার হয়।'

আমার জিজ্ঞাসা শুনে প্রবীণ মিষ্টান্ন বিক্রেতা কি যেন একটু ভেবে তারপর বললেন, 'সবচেয়ে ভাল উকিল?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমার একটা মামলার ব্যাপারে বিশেষ দরকার।'

'সবচেয়ে ভাল উকিল হলেন বলাইবাবু, আমাদের এই জেলার মধ্যে,' তারপর ভদ্রলোক কিঞ্চিত ইতস্তত করে বললেন, 'অবশ্য তিনি যদি মাতাল অবস্থায় না থাকেন।'

আমি একটু চিন্তিত হলাম। 'মাতাল উকিল'। উকিলের আগে মাতাল বিশেষণটা খুব ভাল ঠেকছে না। সুতরাং আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'দু নম্বর ভাল উকিল কে?'

মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী বললেন, 'দু নম্বর ভাল উকিল হলেন ওই বলাইবাবুই, তিনি যখন মত্ত অবস্থায় থাকেন।'

বলা বাহুল্য ভদ্রলোকের এই ধাঁধা আমার পছন্দ হয়নি, আমি অন্য উকিলের খোঁজ করেছিলাম।

এই উকিলবাবু আদালতে মদ খেয়ে আসেন। জানি তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি এত মদ খান কেন?' তিনি বলবেন, 'আমি এত-শত মদ কিছু খাই না। আমি অল্প-অল্প খাই, বারবার খাই।'

সে যা হোক, আদালত নয়, বিদেশী এক শহরে দেখেছি পানশালার নাম 'অফিস' (The Office)। প্রথমে এই চমকপ্রদ নামকরণের ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। পরে রহস্যটা বুঝেছিলাম, এই পানশালা থেকে যত দেরি করেই

বাড়ি ফেরা যাক, মিথ্যে না বলে সত্যি কথাই বলা যাবে, 'অফিসে দেরি হয়ে গেল।'

মদ ও মদ্যপেয় গল্পের শেষ নেই। আগে অনেক বলেছি, পরে অনেক বলব।

আপাতত একটি অনুকাহিনী উপস্থাপন করছি।

এক পানশালায় তিনজন বাঁধা খদ্দের। বেয়ারারা তাদের নাম দিয়েছে, বড়দা, মেজদা, ছোড়দা।

যথারীতি একদিন সন্ধ্যায় এই তিনজনে বসে পান করছিলেন। বড়দা একটু বেশি বেশি খাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে ডোজের মাত্রা বেশি হয়ে যাওয়ায় বড়দা বেহুঁশ হয়ে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

মেজদা এবং ছোড়দার কিন্তু এতে ভ্রূক্ষেপ নেই, বরং বড়দার এই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা দুজনে খুব তারিফ করতে লাগলেন এই বলে যে, 'বড়দার একটা মাত্রাজ্ঞান আছে, ঠিক কখন থেমে যেতে হয় সেটা বড়দা জানেন।'

এইসময় এক আগন্তুক পানশালায় প্রবেশ করে ছোড়দা-মেজদার টেবিলের সামনে বসলেন। তাঁকে বেয়ারা এসে, 'কি দেব?' প্রশ্ন করার আগেই তিনি অধঃপতিত বড়দার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি কে?'

বেয়ারা বলল, 'ইনি বড়দা।'

আগন্তুক বড়দাকে খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তারপর প্রায় ষড়যন্ত্রকারীর মতো গলা নামিয়ে বেয়ারাকে বললেন, 'ওই বড়দাকে যা দিয়েছিলে, ভাই আমাকেও তাই দিয়ো।'

পুনশ্চ :

গঙ্গারাম, আমার পোষা চরিত্র, অবশেষে তার মাতলামির গল্পই বলি। রোববার সকালে অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে হ্যাং-ওভারগ্রস্ত গঙ্গারাম বেশ কয়েকবার আড়মোড়া ভাঙার পর বৌকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁগো, কাল রাতে আমি বাড়ি ফেরার সময় কি কোন হইচই করেছি?'

'না তুমি করোনি।' গম্ভীর মুখে গঙ্গারামের বউ বলল, 'হইচই করার মতো অবস্থা তোমার ছিল না। তবে যারা তোমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তারপর চ্যাংদোলা করে, বাড়ির মধ্যে দিয়ে গেল তারা খুব হইচই করেছিল। পাড়ার সমস্ত লোক জেগে উঠেছিল।'

ওজন

শিশুকাল থেকেই আমি একটু, একটু কেন বেশ প্রগলভ বেশি কথা বলি। ছোট বয়সে কত গুরুজন আমাকে ধমকিয়েছেন, নিজের ওজন বুঝে কথা বল।

দুঃখের বিষয়, সেই গুরুজনেরা কেউই শতায়ু হতে পারেননি। কেউ চর্মচক্ষে দেখে গেলেন না আমার কি পরিণতি হয়েছে। আমার এখনকার ওজন দেখলে তাঁরা অবশ্য কবুল করতেন, 'ওজন মাফিক কথা বলাই যদি হদিশ হয়, তবে এ ছোকড়ার যা ইচ্ছে, যতক্ষণ ইচ্ছে বলার অধিকার জন্মেছে।'

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কবি দীপক মজুমদার গত বছরের নীল জামাটির আয়ু নিয়ে মর্মান্তিক কবিতা লিখেছিলেন।

এতদিন পরে তাঁর কবিতার সারকথা আমি অনুধাবন করতে পেরেছি।

শুধু জামা কেন, কোট-প্যান্ট, পাঞ্জাবি গত বছরের কোনও পোশাকের আয়ু, আমার ক্ষেত্রে, পরের বছর পর্যন্ত গড়ায় না।

তার কারণ অবশ্য একটাই। আমি ক্রমশ স্থূল থেকে স্থূলতর হয়ে যাচ্ছি। গত বছরের কাপড়-চোপড় এ বছর আর গায়ে লাগেনা।

শুধু জামা-কাপড় কেন, লুঙ্গি, গামছা-তোয়ালে, রুমাল পর্যন্ত ছোট হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ছেলের কাছে বিদেশে গিয়েছিলাম, সে আমার অবস্থা দেখে একটা বাথরুম স্কেল কিনে দিয়েছে। প্রতিদিন সকালে সেটায় উঠে ওজন দেখি। প্রায় নেশার মতো হয়ে গেছে ব্যাপারটা।

ওজন বাড়ুক বা কমুক, ওজন নেওয়ার মধ্যে আমার একটা অস্বস্তি বোধ আছে। ঘটনাটা ঘটেছিল মাস ছয়েক আগে। উত্তর কলকাতার এক সিনেমাহলের লবিতে ওজনের যন্ত্রে ওজন নিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ ঘট-ঘট-ঘটাং করার পর একটা কার্ড বেরিয়ে এল তাতে ওজন টোজন কিছু নেই, শুধু লেখা আছে। 'একে একে আসুন।'

অর্থাৎ আমার ওজন দেখে মেশিন আমার প্রসঙ্গে দুজন বলে ভ্রম করেছে। অবশ্য বাড়ির বাথরুম স্কেলে কার্ড বেরোনোর কোনও বন্দোবস্ত নেই। কিন্তু 'একে একে আসুন' কার্ডটা মনে বড় দাগা দিয়ে গেছে।

মোটা মানুষেরা গোলমালে থাকে না। কারণ তেমন গোলমাল দেখা

দিলে দৌড়ে পালাতে হয়। মোটা মানুষদের পক্ষে সেটা মোটেই সম্ভব নয়।

তবে ওজন নিয়ে শুধু স্থূলদেহীরাই যে মাথা ঘামান তা মোটেই নয়। ক্ষীণ দেহীরাও তাদের কম ওজন নিয়ে খুব চিন্তিত।

'কাণ্ডজ্ঞানে' এই রকম এক ব্যক্তির কথা লিখেছিলাম। সে আমার কাছে একটা টাকা চেয়েছিল এই বলে যে, 'তিনদিন কিছু খাইনি। দাদা একটা টাকা দেবেন।'

এই তিনদিনের অনাহারী ব্যক্তিটি একটাকায় কি খাবে? আমি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'একটাকায় কি খাওয়া হবে তোমার?'

লোকটি বলল, 'খাওয়ার জন্য আপনার কাছে টাকাটা চাইনি।'

আমি অবাক, 'তা হলে?'

লোকটি বলল, 'তিনদিন না খেয়ে আমার কতটা ওজন কমল সেটা ওজনের মেশিনে দেখতাম। আজকাল তো একটাকার কমে ওজন নেওয়া যায় না, তাই একটা টাকাই চাইছিলাম।'

আমি অবাক হয়ে লোকটিকে একটা টাকা দিয়েছিলাম।

পুনশ্চ :

গঙ্গারাম ছিপছিপে মানুষ। তার ওজনের তথা অবয়বের তেমন কোনও হেরফের দেখা যায় না।

একদিন ওজনের প্রসঙ্গ উঠতে সে বলল, সে নিউ মার্কেটের একটা ওজনের মেশিন থেকে ওজন নেয়। সপ্তাহে অন্তত একবার, অনেক সময় সপ্তাহে দু'তিনবারও ওজন নেয়। ওদিকেই গেলেই ওজন নেয়। নিজের ওজন নেওয়ার নেশা ধরে গেছে তার।

গঙ্গারাম বলল, 'ওজনের জন্যে নয়, ওজনের কার্ডের জন্যে ওজন নিই।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'ওজনের কার্ড এমনকি লোভনীয় জিনিস?'

গঙ্গারাম বলল, 'কার্ডে ওজন ছাড়াও মাধুরী, কাজল এই সব হিরোইনের ছবি পাওয়া যায়। সঙ্গে ভাগ্যফল, 'যাকে বন্ধু ভাবছ, সে তোমার বন্ধু নয়', 'কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন।'

আমি তাকে থামিয়ে বললাম, 'এত ওজন নিচ্ছ, ওজনের হেরফের কিছু বুঝছ?' গঙ্গারাম বলল, 'পাঁচ পাউন্ড ওজন বেড়ে গেছে।'

'কিন্তু তোমাকে দেখে তো বোঝা যায় না', আমি একথা বলতে গঙ্গারাম

বলল, 'আমার তো ওজন বাড়েনি। ওই যে কার্ডগুলো সব আমার জামা-প্যান্টের পকেটে রয়েছে সেগুলোর ওজন পাঁচ পাউন্ড।'

কাটোয়ার ডাঁটার কাবাব

আমাদেরই চেনাশোনা এক ভদ্রলোকের স্ত্রী একদিন গভীর রাতে তাঁকে ঘুম থেকে ধাক্কা দিয়ে তোলেন। ভদ্রলোক তখন গাঢ় ঘুমে নিমগ্ন ছিলেন।

তিনি স্ত্রীর ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে সহধর্মিনীর কাছে জানতে চান, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

উত্তেজিতভাবে ভদ্রমহিলা অঙ্গুলি নির্দেশ করে ও পাশের রান্নাঘরের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই খুট-খাট শব্দ আসছে। নিশ্চয়ই রান্নাঘরে চোর ঢুকেছে।'

সত্যিই রান্নাঘরের দিক থেকে খুট-খাট, খচমচ শব্দ আসছে। কিছুক্ষণ সেই শব্দ শোনার পরে ভদ্রলোক বললেন, 'মনে হচ্ছে কেউ ঢুকেছে। কিন্তু রান্নাঘর থেকে কি আর চুরি করবে? ফ্রিজ, গ্যাস-ওভেন এসব তো আর নিয়ে যেতে পারবে না। তাছাড়া তোমার ওই সমস্ত চিনেমাটির বাসন আর কাচের গেলাস সেগুলো কোনও চোর নেবে না।'

এ কথা শুনে ভদ্রলোকের স্ত্রী অতিশয় আকুল হয়ে উঠলেন, 'ওগো আমি ওসব চুরি যাবে বলে কিছু ভাবছি না।'

সদ্য জাগরিত ঘুম জড়ানো চোখ কচলাতে কচলাতে ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে বললেন, 'তা হলে!'

এবার ভদ্রমহিলা আসল কথা ফাঁস করলেন, 'আমি যে দয়াসুন্দরী দাসীর "আমার কালের রান্না" বই দেখে সারাদিন বসে কাটোয়ার ডাঁটার কাবাব বানালাম, চোরটা যদি সে সব খেয়ে ফেলে।'

ঘুমকাতুরে স্বামী পাশ ফিরে শুতে শুতে বললেন, 'এ নিয়ে তুমি মোটেই মাথা ঘামিয়ো না। লক্ষ্মীটি, এখন একটু ঘুমোতে দাও। আমি শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে ওই চোরের ডেড-বডি গাড়ির ডিকিতে ভরে লাশ গঙ্গার ঘাটে ঢেলে দিয়ে আসব। এ নিয়ে তুমি একদম চিন্তা না করে এখন চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়।' কাটোয়ার ডাঁটার কাবাব খেয়ে চোর যে মারা পড়বে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

এ গল্পটি সত্যিই মারাত্মক।

বোধহয় কাটোয়ার ডাঁটার কাবাবের চেয়েও মারাত্মক। স্বামী বেচারার সম্ভবত দয়াসুন্দরী দাসীর 'আমার কালের রান্না' দুচার পদ ইতিমধ্যে খাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

ভদ্রলোকের কাছে এই গল্প শোনার পরে, তাঁকে বলেছিলাম, 'এটা আপনি বাড়াবাড়ি করেছেন। দয়াসুন্দরীর রন্ধন প্রণালীর দুয়েক পদ খেয়ে আপনি তো বেশ বেঁচে আছেন।'

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'দাদা, একে কি বেঁচে থাকা বলে?'

ভদ্রলোকের প্রশ্নের কোনও উত্তর আমার কাছে ছিল না। কে কিভাবে বেঁচে আছে, কতটা বেঁচে আছে, অন্য কারও পক্ষে সেটা বোঝা কঠিন, অনুধাবন করা অসম্ভব।

কিন্তু আমি একটা ভুল করেছিলাম।

শ্রীমান গঙ্গারামকে এই গল্পটা বলেছিলাম।

পরের সপ্তাহে গঙ্গারাম এসে বলল, 'দাদা, ফাটাফাটি কাণ্ড।'

আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম, 'কার সঙ্গে কার ফাটাফাটি?'

গঙ্গারাম বলল, 'আমার সঙ্গে আমার বউয়ের ফাটাফাটি।'

'সর্বনাশ, কি হয়েছে?' আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করি।

গঙ্গারাম বলল, 'সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি বউ হাসিমুখে একটা কাগজের কাটিং খুবই তন্ময় হয়ে পড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওটা কি?' বউ কাটিংটা এগিয়ে দিল, দেখি ওপরে লেখা আছে, 'লাউয়ের ডাঁটার তন্দুরি।'

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তারপর?'

গঙ্গারাম বলল, 'কাটিংটা ফেরত দিতে বউ বলল, 'এই রোববার আমার আটটা লাউ লাগবে।' তারপর আমার মুখ ভার দেখে বলল, 'আজ বিকেলে পাড়ার লাইব্রেরির একটা ম্যাগাজিন থেকে এই কাটিংটা লুকিয়ে ছিঁড়ে এনেছি। কোনও অন্যায় হয়েছে?'

উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি গঙ্গারামকে প্রশ্ন করি, 'তুমি কি বললে?'

গঙ্গারাম বলল, 'আমি বউকে বলি, তুমি লাইব্রেরির আইন ভেঙেছ কিন্তু বহু পরিবারের উপকার করেছ। সবাই তো আর এই বাজারে আটটা লাউ কিনতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'তারপর?'

গঙ্গারাম বলল, 'বউ কি বুঝল কি জানি। সঙ্গে সঙ্গে ফাটাফাটি শুরু হয়ে গেল।'

শরৎচন্দ্র এবং রসিকতা

একদা সুপ্রচলিত (কিন্তু এখন অনিয়মিত) লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'সাগরপারে' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক ডাঃ হিরন্ময় ভট্টাচার্য সম্প্রতি ডাকে আমাকে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠিয়েছেন।

বইটি একটি একাঙ্ক নাটিকা, নাম 'রসিক শরৎচন্দ্র'।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঠিক এই নামে হিরন্ময়বাবুর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও আছে। একই নামের সেই বইটি শরৎচন্দ্রের রসিকতা এবং অনুরূপ বিষয়াদি নিয়ে রম্যরচনাধর্মী প্রবন্ধের সংকলন।

ঠিক এই জাতীয় আরো অনেকগুলি বই হিরন্ময়বাবু ইতিপূর্বে রচনা করেছেন, যেমন রসিক রবীন্দ্রনাথ, রসিক সুভাষচন্দ্র।

ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং সরসতার গুণে তথ্যবহুল এই বইগুলি পাঠক মহলে বেশ জনপ্রিয়।

'রসিক শরৎচন্দ্র' নাটিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র আকারের। বড় জোর তিনহাজার শব্দের। বড় বড় পাইকা হরফে ছাপা মূল রচনাটি বড় জোর হাফ ক্রাউনের কুড়ি-বাইশ পৃষ্ঠা হবে, অর্থাৎ হাজার তিনেক শব্দ।

এই নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল গত বছরের গ্রীষ্মে লন্ডন শহরে, কনভয় হলে।

'বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' হয়েছিল লন্ডন শহরে। সেখানেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'রসিক শরৎচন্দ্র' নাটিকাটি মঞ্চস্থ হয়, আটানব্বুই সালের তেইশে মে তারিখে।

শ্রোতাদের পছন্দসই হয়েছিল নিশ্চয়ই, তা না হলে হিরন্ময়বাবু এই পুস্তিকার ভূমিকায় একথা বলতেন না যে, 'তিন অঙ্কের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের ইচ্ছে আছে।'

সে যা হোক এই নাটিকাটি শরৎচন্দ্রের একটি অপারেশন নিয়ে। হিরন্ময়বাবু নিজে সম্ভবত ডাক্তার। এই নাটকের প্রথম দিনের অভিনয়ের অধিকাংশ কুশীলবই দেখা যাচ্ছে চিকিৎসক, নাটকের বিষয়বস্তুও ডাক্তারি সংক্রান্ত।

অল্প বয়সে যখন শরৎচন্দ্র লেখক হননি, সেই সময়ে তাঁকে হার্নিয়া অপারেশন করতে হয়, সেই অপারেশনটি হয়েছিল একটি ছোট হাসপাতালে।

শরৎচন্দ্রের অপারেশন করতে গিয়ে সেই হাসপাতাল এক ধরনের অভাবিত গোলমালে পড়েছিল। ব্যাপারটা রীতিমত হাসির ঘটনা।

সেই ঘটনা নিয়েই এই নাটিকা। খুব সংক্ষিপ্ত করে মূল ব্যাপারটা বলি।

কথিত আছে, অতি অল্প বয়েসেই শরৎচন্দ্র নানা রকম নেশাভাং করতেন। ফলে অপারেশনের আগে যখন শরৎচন্দ্রকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করার কথা, তিনি আর সহজে অজ্ঞান হন না। নিয়মিত নেশা করার ফলে ওই ক্লোরোফর্মের প্রভাব নেই তাঁর ওপরে।

এখানে হাসপাতালের ডাক্তারের ডায়ালগটি তুলে দিচ্ছি—

'হায়! হায়! বদমায়েসটা আমার চার আউন্স ক্লোরোফর্ম নষ্ট করে ফেলল। .... কত কষ্ট করে আমি হাসপাতাল চালাই। এ রকম আর কয়েকটা কেস

পেলেই আমার দফা-রফা, লাল বাতি জ্বালিয়ে ছাড়বে।

বলা বাহুল্য, এ গল্প শরৎচন্দ্রের নিজেরই বলা। নিজের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র এ রকম গল্প অনেকই বলেছেন। তার সব হয়ত সত্যি নয়, নেহাতই মজা করার জন্যে বলা।

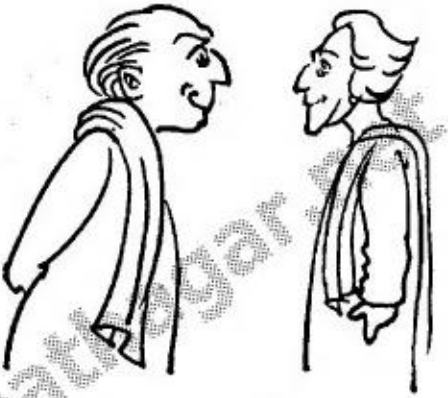

শরৎচন্দ্রের কথা নয়, শরৎচন্দ্রকে নিয়ে অন্য এক শরৎচন্দ্রের কথা বলি।

শরৎচন্দ্রের সময়ে আরেকজন শরৎচন্দ্র খুব বিখ্যাত ছিলেন, তিনি হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, যিনি দাঠাকুর নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এই দাঠাকুর অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন, তিনি একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তার নাম 'বিদূষক'।

সেই সময়ে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে এক সমাবেশে দাঠাকুর শরৎচন্দ্রের দেখা হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁকে দেখে হেসে সম্বোধন করলেন, 'এই যে বিদূষক শরৎচন্দ্র।'

সঙ্গে সঙ্গে দাঠাকুর বললেন, 'এই যে চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র।'

মকারান্ত

এক. লুজ ক্যারেকটার

আমার নিন্দুকেরা অবশ্যই এই ভেবে খুশি হবেন যে তারাপদ এতদিনে উপযুক্ত বিষয় পেয়েছেন। তা তাঁরা যাই বলুন আমি লুজ ক্যারেকটার দিয়েই শুরু করছি। 'লুজ ক্যারেকটার' শব্দটি খাঁটি বাংলা শব্দ। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলে রাখি ইংরেজি 'Character' এবং বাংলা 'চরিত্র' শব্দ দুটি এক নয়, দুইয়ের মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

সে যা হোক। আমাদের বিষয় চরিত্র নয়, চরিত্র দোষ। বাংলা অভিধানে, রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় চরিত্রদোষের অর্থ দেওয়া আছে, 'লাম্পট্য, সুরাসক্তি।'

আমার এই ক্ষুদ্র রম্য নিবন্ধে এই দুটো বিষয়েই মনোনিবেশ করব। প্রথমে লাম্পট্য এবং সেই সূত্রে এই খণ্ড অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে লুজ ক্যারেকটার বা স্খলিত চরিত্র।

শ্রীযুক্ত তপন সিংহ পরিচালিত 'বাঞ্ছারামের বাগান' চলচ্চিত্রটি যাঁরা কখনও দেখেছেন, তাঁদের কাছে 'লুজ ক্যারেকটার' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করার মানে হয় না। ওই সিনেমায় অভিনেতা দীপঙ্কর দে এক বৃদ্ধের ভূমিকায় ছিলেন, তিনি তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে কাউকে গালাগাল দেওয়ার জন্য 'লুজ ক্যারেকটার' বলে অভিহিত করতেন। লুজের উচ্চারণ ছিল, 'লূ-উ-উ-জ্ঝ'।

তা এই সব লুজ ক্যারেকটার বা লম্পট চরিত্রের লোকেদের আমরা সবাই মোটামুটি অল্প-বিস্তর চিনি। আমার আপনার মতোই এঁরাও সংসারে বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এঁরা সাধারণত ফিটফাট থাকেন। এঁরা সর্বদাই হাসিমুখ। ঘাড়ে পাউডার, চুলে টেরিকাটা, রুমালে সুরভি। এঁরা রমনী-মোহন। ওঁদেরই জন্য শাস্ত্রে উপদেশবাক্য রচিত হয়েছিল, 'পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখবে।'

এই সব 'লুজ ক্যারেকটার' বা লম্পট বিষয়ে বিশেষ কিছু লিখবার অধিকার বা যোগ্যতা আমার নেই। বহুকাল আগে 'দেশ' পত্রিকায় 'বিদ্যাবুদ্ধি'তে

লাম্পট্য নিয়ে কিঞ্চিত অনধিকার চর্চা করেছিলাম।

সেও করেছিলাম বিলিতি বই টুকে। আমাদের দেশে এরকম গুরুতর বিষয় নিয়ে মজার গল্প হয় না। লাম্পট্য নিয়ে মজা করতে গেলে সবাই ছি ছি করবে।

এই সব কাহিনীমালার নায়ক ছিলেন সেই ভদ্রলোক, যিনি বাঁকাচোখে নিজের বিবাহিত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'মাইরি বলছি, তোমাকে আজ যা দেখাচ্ছে না, একেবারে পরস্ত্রীর মতো।'

এই ভদ্রলোক সম্পর্কে অন্য একটি গল্পে দেখা যায় যে তাঁর সেই পরস্ত্রীর মতো সুন্দরী স্ত্রী তাঁর এক বান্ধবীর কাছে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছেন।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর এক পুরনো বান্ধবী দেখা করতে এসেছেন। বলা বাহুল্য, ভদ্রমহিলার পতিদেবতা তখন বাসায় নেই। বান্ধবী ভদ্রলোকের কথা জিজ্ঞাসা করাতে স্ত্রী বললেন, 'ও কোনদিনই সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে না। ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। কোথায় যে যায়? কী যে করে? আমি খুবই চিন্তায় থাকি।'

এ পর্যন্ত শুনে জিজ্ঞাসু বান্ধবী বললেন, 'কোথায় যায়, কী করে—ওসব না জানাই ভাল। জানতে পারলে আরও বেশি চিন্তায় থাকবে।'

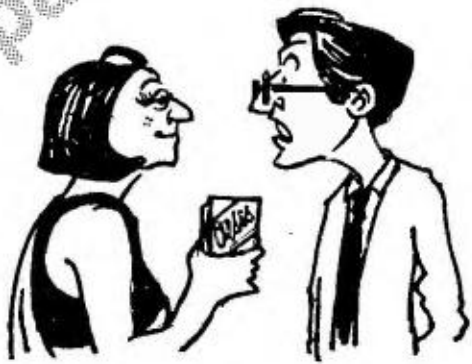

কোন বিবাহিত ব্যক্তির চরিত্রদোষ হলে তা তিনি যতই বুদ্ধিমান হোন, যতই কায়দা-কানুন করুন শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী সেটা ধরে ফেলবেন।

মিস্টার চৌধুরী গত কয়েক মাস ধরে অত্যন্ত সংগোপনে এবং সযতনে অফিসে তাঁর সহকর্মিনীর সঙ্গে প্রবল প্রেমলীলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুবোধ বালকের মতো দৈনিক যথাসময়ে বাড়ি ফিরতেন যাতে তাঁর স্ত্রী কোনরকম সন্দেহ না করেন। এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে মিসেস চৌধুরী কিছু টের পাচ্ছেন না।

কিন্তু গোলমাল হল মিস্টার চৌধুরীর জন্মদিনে। সেদিন মিসেস চৌধুরী এক বোতল একটি বহু বিজ্ঞাপিত চুল পড়ে যাওয়ার ওষুধ স্বামীকে উপহার দিলেন।

মিস্টার চৌধুরী মধ্যযৌবনে পৌঁছেছেন কিন্তু এখনও তাঁর ঘনকৃষ্ণ কেশ, ব্যাকব্রাশ করলে মাথায় ঢেউ খেলে যায়। তিনি জন্মদিনে স্ত্রীর কাছ থেকে এই উপহার পেয়ে কিঞ্চিত বিস্মিত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'এটা কী দিলে আমাকে? আমার কি চুল উঠছে?'

'তোমার উঠছে না,' মিসেস চৌধুরী খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'কিন্তু তোমার প্রেমিকার খুব চুল উঠছে। রোজই তোমার কোটে লেগে থাকে। আমাকে বুরুশ করে পরিষ্কার করতে হয়।'

এর পরের গল্পটি নিতান্ত ঘরোয়া।

একটি শিশুর জন্য গৃহশিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছে। নবযুবতি এক মহিলা বাসায় শিশুটিকে পড়াতে আসেন। তখন বাসায় শিশুটি এবং একটি কাজের মেয়ে ছাড়া আর প্রায় কেউই থাকে না।

এর মধ্যে একদিন শিক্ষিকা পড়াতে এসেছেন সেদিন শিশুটির বাবা-মা দুজনেই বাসায় রয়েছেন, কী যেন একটা ছুটির দিন ছিল সেটা।

সে যা হোক, সেদিন শিক্ষিকা যখন পড়ানো শেষ করে চলে যাচ্ছেন, তখন শিশুটির মা দাঁড়িয়ে। মাতৃদেবী শিশুকে বললেন, 'দিদিমণিকে টা-টা বাই-বাই কর। দিদিমণিকে একটা চুমো খাও।'

অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে 'টা-টা বাই-বাই' করে শিশুটি বলল, 'আমি কিন্তু কিছুতেই দিদিমণিকে চুমু খাব না।'

মা অবাক, 'সে কী? কেন?'

শিশুটি বলল, 'চুমু খেলে দিদিমণি আমাকে চড় মারবে।'

মা বললেন, 'ছি! ছি! চুমু খেলে দিদিমণি চড় মারবে কেন?'

শিশু জানাল, 'একটু আগে বাবা দিদিমণিকে চুমু খেয়েছিল। বাবাকে দিদিমণি একটা চড় মেরেছে।'

লাম্পট্য অবশ্য সদাসর্বদাই একতরফা বা পুরুষালি ব্যাপার নয়। এক হাতে তালি বাজে না। মহিলারাও চরিত্রদোষে ভোগেন।

এক ভদ্রমহিলাকে একদিন তাঁর স্বামী একদিন দিনদুপুরে নিজের বাড়িতে শয়নঘরের মধ্যে এক ব্যক্তির সঙ্গে আপত্তিকর, অশালীন অবস্থায় ধরে ফেলেন।

হই হই কাণ্ড! ফাটাফাটি ব্যাপার!

ঘটনাটা শেষপর্যন্ত থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়াল। প্রবীণ বিচক্ষণ দারোগাবাবু সব ঘটনা শুনে তারপর ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'আপনি তাহলে আপনার স্বামীকে ঠকাচ্ছিলেন?'

ভদ্রমহিলা ফোঁস করে উঠলেন, 'আমি ঠকাচ্ছিলাম? আমার বরই আমাকে ঠকিয়েছে।'

দারোগাবাবু বললেন, 'সে আবার কী ব্যাপার?'

ভদ্রমহিলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'ও আমাকে বেরনোর সময়ে বলে গিয়েছিল, ফিরতে রাত হবে। দুপুরের মধ্যেই ফিরে এসে আমাকে জব্দ করল। ওই তো ঠকাল। আমি আর কী ঠকালাম।'

এরকম সব গোলমেলে গল্প বেশি না বলাই বোধহয় উচিত। শুধু আরেকটি এবং সেটি পুরনো গল্প।

সকালের খবরের কাগজে একটি রোমহর্ষক সংবাদ বেরিয়েছে। চা খেতে খেতে সংবাদটা পড়ে বিনতা শিউড়িয়ে উঠল, 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার।'

তার রুমমেট সুরমা এই শুনে কাগজটা হাতে নিয়ে সংবাদটা পড়ে খুব গম্ভীরভাবে বলল, 'ব্যাপারটা আরও সাংঘাতিক হতে পারত।'

এই শুনে বিনতা বলল, 'আর কী সাংঘাতিক হবে? ফিল্মস্টার ভুবনমোহন এক মহিলার সঙ্গে একটি হোটেলকক্ষে ছিলেন, এমন সময় দরজায় করাঘাত। ভুবনমোহন উঠে দরজা খুলে দিতেই ভুবনমোহনের স্ত্রী বিউটিরানি দেবী ঘরের মধ্যে অতর্কিতে প্রবেশ করে ভুবনমোহনের সঙ্গিনীকে রিভলভার দিয়ে ছয়টি গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মৃত্যু হয়।'

সংবাদপত্রের খবরটি সংক্ষিপ্ত করে বলে বিনতা আবার বলল, 'আর কী সাংঘাতিক হবে?'

সুরমা বলল, 'গতকাল ভুবনমোহনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমার। মাথা ধরেছে বলে যেতে পারিনি। গেলে ওই হোটেলের ঘরে আমিই বিউটিরানির রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতাম।'

শুনে বিনতা বলল, 'সর্বনাশ!'

তখন সুরমা বলল, 'তাহলে বল, ব্যাপারটা আরও সাংঘাতিক হতে পারত।'

দুই. পানাশক্তি

'যদ্যপি আমার গুরু
শুঁড়ি বাড়ি যায়,
তদ্যপি আমার গুরু
নিত্যানন্দ রায়।'

লম্পটের পরে আমাদের দ্বিতীয়াংশ মদ্যপ নিয়ে।

কথায় আছে, 'মাতালের সাথী শুঁড়ি।' শুঁড়ি হল মদ বিক্রেতা। শুঁড়িবাড়িতে লোকে মদ খেতে যায়।

এ নিয়ে আলোচনার আগে একটা জিনিস স্পষ্ট করা দরকার। লম্পট আর মদ্যপ, এক জিনিস নয়। বহু লম্পট আছে যারা সুরা স্পর্শ করে না। আবার প্রকৃত মদ্যপের লাম্পট্য আসক্তি নেই। যে মদ খায় সে শুধুই মদ খায় আর মদ তাকে খায়, তার আর কিছুই করার থাকে না। তবে এমন অনেক লোক আছে, যারা কিছু পরিমাণ মদ্যপান করে খুন-ডাকাতি করতে যায়, বলাৎকারের চেষ্টা করে কিংবা বলাৎকার করেই ফেলে; তাদের কথা আলাদা।

এদিকে লম্পটের মদ্যপ হলে বিপদ। তাকে ভেবেচিন্তে, মেপে চলতে হয়। তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে নানারকম অভিনয় করতে হয়, মুখোশ পরতে হয়।

মাতালের মুখোশ নেই। সে অভিনয় করতেও অপারগ। তার পক্ষে রমনীর মন জয় করা কঠিন। তবে কখনও কখনও দেখা যায় (মদ্যপের প্রতি সহানুভূতি চিন্তা) অনুকম্পাবশত অনেক মহিলা কোন কোন মাতালের জন্য দুর্বলতা পোষণ করেন, অবশ্য সেই মদ্যপ যদি কোন কবি বা শিল্পী কিংবা বখে

যাওয়া প্রতিভা হয়।

এসব তত্ত্বকথা, কচকচি মোটেই সুবিধের নয়। বরং এবার মাতালের গল্পে চলে যাই।

তবে এখানে আমার একটা বিশেষ অসুবিধে আছে। মদ ও মাতাল নিয়ে আমি এযাবৎকাল এত বেশি গল্পকথা লিখেছি যে পাঠক-পাঠিকাদের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক—গল্পগুলো নতুন তো? নাকি নতুন বোতলে পুরনো মদ।

সত্যি কথা এই যে, শুধু মদ আর মাতাল নয়, যে-কোন বিষয়েই নতুন গল্প পাওয়া কঠিন। তবু এরপরে যে গল্পগুলি পাঠকের দরবারে পেশ করছি তার একাধিক গল্প টাটকা এবং আনকোরা।

প্রথম গল্পটি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের, এ গল্পটি জ্ঞানত অদ্যাবধি কোথাও লিখিনি।

মধ্য কলকাতায় পুরনো জানবাজার অঞ্চলে একদা বারদোয়ারি নামে একটি দিশি মদের পানশালা অর্থাৎ শুঁড়িখানা ছিল। হয়ত এখনও আছে, বাজার-ভাঁটিখানা-মেলা-বেশ্যাপাড়া-রমস্থান এগুলো সহজে অবলুপ্ত হয় না। উঠে গেলেও আশেপাশে টিকে থাকে।

সে যা হোক, নবীন যৌবনে বন্ধুবান্ধব সহযোগে কখনও কখনও ওই বারদোয়ারিতে যেতাম। সেখানে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সুধামাধববাবু। মিলের ধুতি আর নীল ফুল শার্ট, নেহাত ছাপোষা গৃহস্থ। তিনি বেলঘরিয়া থেকে এই বারদোয়ারিতে আসতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এত দূর আসেন?' তিনি বলেছিলেন, 'পাঁইটে চার আনা সস্তা হয়।' এরপরে যখন আমি বললাম, 'যাতায়াত খরচা তো আছে।' সুধামাধববাবু বলেছিলেন, 'যাতায়াত খরচা হিসাব করে যতক্ষণ পর্যন্ত মদের দামে উশুল না হয় খেয়ে যাই। ঠকবার লোক আমি নই।'

এরকম যুক্তি মাতালের পক্ষেই সম্ভব।

এই মাতালই ড্রেনে পড়ে গেলে পুলিশকে বলে, 'এখন আর আমি তোমার এলাকায় নই, যাও জলপুলিশ ডেকে আন।'

এই রকম এক মাতাল রাস্তায় ভিক্ষে করছিল। তাকে এক পথচারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভিক্ষে করছ কেন?' সে জবাব দিল, 'মদ খাওয়ার জন্য।' এরপর আবার প্রশ্ন, 'মদ খাবে কেন?' জবাব, 'ভিক্ষে করার সাহস সঞ্চয় করার

জন্য।'

অবশেষে পানাসক্তি এবং লাম্পট্যের একটি যুগ্ম গল্প বলি। দুঃখের বিষয় গল্পটি পুরনো, কিন্তু অসামান্য।

গভীর রাতে মত্তাবস্থায় অনিমেষবাবু বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির সদর দরজায় চাবিটা লাগানোর চেষ্টা করছেন, এমন সময় পুলিশের জমাদার তাঁকে ধরে।

জমাদারকে দেখে অনিমেষবাবু তাঁকে বাড়িটা একটু শক্ত করে ধরতে বলেন কারণ বাড়িটা এত কাঁপছে যে তিনি চাবি লাগাতে পারছেন না।

জমাদার সাহেব অনিমেষবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এত রাতে এখানে কী হচ্ছে?'

অনিমেষবাবু বলেন, 'এটাই আমার বাড়ি। আমি বাড়ির মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছি।'

ঘুঘু জমাদার সাহেব কোন কথা সহজে বিশ্বাস করেন না, তিনি অনিমেষবাবুকে বললেন, 'চলুন আপনাকে ভেতরে দিয়ে আসি।' টলটলায়মান অনিমেষবাবুকে ধরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে জমাদার সাহেব দেখলেন ঘরের মধ্যে বিছানায় এক মহিলা এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন। সেই দৃশ্য দেখে নিশ্চিত হয়ে অনিমেষবাবু বললেন, 'এবার বুঝছেন তো এটা আমার বাড়ি। ওই বিছানায় শুয়ে আছেন আমার মিসেস, আর যাকে জড়িয়ে ধরে আছেন সে হলাম আমি।'

এতদূর লেখার পরে দু'একজন স্মরণীয় চরিত্রের কথা মনে পড়ছে। যাঁদের নাম বলা যাবে না। যাঁরা ছিলেন সোনায় সোহাগা। যেমন লম্পট, তেমনই মদ্যপ। উপরের গল্পে পুরুষটি মদ্যপ এবং স্ত্রীটি লম্পট, অবশ্য মহিলাকে লম্পট বলা যায় কিনা কে জানে।

তা যাক কিংবা না যাক মদ্যপ-কাম-লম্পটের একটা পুরনো গল্প বলি।

এ গল্পের ভদ্রলোক আসলে মদ্যপ, লম্পট হওয়ার চেষ্টা করছেন। নবলব্ধা বন্ধুপত্নীর সাহচর্যে লাম্পট্যের সাহস সঞ্চয় করার জন্য তিনি ক্রমাগত মদ খেয়ে যাচ্ছিলেন। বাধা দিলেন বন্ধুপত্নী, তিনিও যথাসাধ্য সঙ্গ দিচ্ছিলেন। অবশেষে মহিলা বাধা দিলেন, 'ওগো তুমি আর মদ খেয়ো না, তোমার মুখ কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে।'